ভারতবর্ষ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরি
হইতে প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

কলিকাতা,

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "দিনময়ী প্রেসে"
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনে (নব পর্য্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে সামান্য পরিরর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।
নববর্ষ ১
ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৬
ব্রাহ্মণ ৩১
চীনেম্যানের চিঠি ৫২
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ ৭১
বারোয়ারি-মঙ্গল ৮২
অত্যুক্তি ১০৬
মন্দিরের কথা ১২৭
ধম্মপদং ১৩৪
বিজয়া-সম্মিলন ১৪৬

ভারতবর্ষ।

নববর্ষ।

অধুনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হোক—দূরে হোক্, দিনে হোক্—দিনের অবসানে হোক্, কর্ম্ম করিতে হইবে। কি করি, কি করি,—কোথায় মরিতে হইবে—কোথায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্তচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক্, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে! এই কর্ম্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন একএকটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন, দুর্গম হিমালয়-শিখরে যে লোমশছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্তচিত্ত সীল্ এবং পেঙ্গুয়িন্ পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষার-মরুর মধ্যে নির্ব্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্রনীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে,—এবং

---

* বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত।

আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্ম্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্ম্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট—অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসনগ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিলগৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন্ ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইঁহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে? ইঁহার দক্ষিণ হস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইঁহার কাজকে লীলার মত মনে হয়, ইঁহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মত জ্ঞান হয়। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া স্থিতিকেই গতির উর্দ্ধে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—উর্দ্ধশ্বাস কর্ম্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্ম্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা,—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে, ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট্ মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্ম্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ

করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজ-সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, সৈনিক-সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত, আচাররক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজরক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করা, তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান

করিয়াছে। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে,—ইংরাজি কোর্ত্তা, ইংরাজের দোকানের আস্‌বাব, ইংরাজি মাষ্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজিস্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি —তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্য্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে;—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা

আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব্ব বেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতূহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহার দ্বারা আহত হয় না এবং তাহাকে আঘাত করে না। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োনথ্‌সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। ধর্ম্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে,—যেখানে ভাষা, আকৃতি, বেশভূষা, সমস্তই স্বতন্ত্র, সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত—সে নিজের চারিদিকে একটি

চিরস্থায়ী নির্জ্জনতা বহন করিয়া চলে—সেইজন্ত কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্ব্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে, সেখানে কোন বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই—তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক্ হউক্, আরব হউক্, চৈন হউক্, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।

এই একাকিত্বের মহত্ত্ব যাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না, সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্বদ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধ-বিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে—সেজন্ত এ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রয়োজন হয় নাই। কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত—সর্ব্বপ্রকার বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে—তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না—সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্ম্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধন-সম্পদ্, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্ম্মচর্চ্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ সম্পত্তি একলার নহে—আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন, আমাদের কর্ত্তব্য একলার।

এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা-করা কিছু নহে—করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবেও না। এমন কি, বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন একজায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে, সে একত্র হইবার ত্রুটিতে নহে—তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভাল হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষার বিষ জমিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেষ্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন, "তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড় কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিয়ো না। আমরা জার্ম্মাণী হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি—ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।" এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও

দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্ম্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝেমাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড় দল ছোট দলকে পিষিয়া ফেলে, বড় টাকা ছোট টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মত চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার,—একাকিত্বের আব্রুটুকু, থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে

আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখে। যদি একমুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যায়, তবে সেই ক্ষণকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলনলাভ, তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড়তাকে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্ম্মের জটিলতাকেও সরল করিয়া আনিয়া মানুষে-মানুষে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে, কর্ম্মে এবং ধ্যানে প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্বচর্চ্চার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী—সে ও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম্ম করে; শিল্পী—সে-ও নিশ্চিন্তমনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে। এই অবকাশের বিস্তারে গৃহকে, মনকে, সমাজকে কলুষের ঘনবাষ্প হইতে অনেকটাপরিমাণে নির্ম্মল করিয়া রাখে—দূষিত বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং মলিনতার আবর্জ্জনাকে একেবারে গায়ের পাশেই জমিতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে যে রিপুর দাবানল জ্বলিয়া উঠে, ভারতবর্ষে তাহা প্রশমিত থাকে।

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নববর্ষ আশিষ-বর্ষণে ও কল্যাণশস্যে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সঙ্কল্পকে স্ফীত করিবার জন্য সুচিরকাল অপেক্ষা না করিয়া যে যেখানে আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, স্থিরশান্তচিত্তে ধৈর্য্যের সহিত —সন্তোষের সহিত পুণ্যকর্ম্ম—মঙ্গলকর্ম্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড়ম্বরের অভাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কুণ্ঠিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কুটীরে থাকিয়া, মাটিতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই; ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মকে, কর্ম্মের সহিত

শান্তিতে জড়িত করিয়া রাখি; চাতকপক্ষীর ন্যায় বিদেশীর করতালি-বর্ষণের দিকে ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া না থাকি; তবে ভারতবর্ষের ভিতর-কার যথার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি আমরা যদি আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, তবে মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে। এবং সে মর্য্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈত্রিককর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুলভতম, তাহা পালনেই তাহার গৌরব—তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে—বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্য্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবি প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্য্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে য়ুরোপের পনেরো-আনা লোক দীনতায়, ঈর্ষায়, ব্যর্থ প্রয়াসে অস্থির। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্ন-শ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্ম্মবিভেদ—শ্রেণীবিভেদ সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত

করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে—বড়দের অনাত্মীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোট-বড়র অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্ব্বত্রই সকলপ্রকার ছোটর সংখ্যাই অধিক ও বড়র সংখ্যাই স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্য্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

য়ুরোপে এই অমর্য্যাদার প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেখানে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই, লজ্জাবোধ করে। গর্ভধারণ করা, স্বামি-সন্তানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষ বড়, কর্ম্মবিশেষ বড় নহে; মনুষ্যত্বরক্ষা করিয়া যে-কর্ম্মই করা যায়, তাহাতে অপমান নাই;—দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে,—সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাখা যায়, এ ভাব য়ুরোপে স্থান পায় না। সেইজন্য সক্ষম, অক্ষম, সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথাকর্ম্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা য়ুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার,—ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান। বিলাতে এই সমস্ত কাজে যাহারা প্রত্যহ রত থাকে, শুনিতে পাই, তাহারা ইতরভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়। কারণ, কাজকে ছোট জানিয়া তাহা করিতে বাধ্য হইলে, মানুষ নিজে ছোট হয়। আমাদের

লক্ষ্মীগণ যতই সেবার কর্ম্মে ব্রতী হন,—তুচ্ছ কর্ম্মসকলকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন,—অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রীসৌন্দর্য্যে-পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন—তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্যকথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পরে আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়ীতে শ্যামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগ্‌লামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত—এবং সেই বৃথাচেষ্টায় সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্য্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোট সুযোগ পাইলেই বড়কে খেদাইয়া যায় না, এবং বড়ও ছোটকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে খেদাইয়া রাখে না।

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়াই

তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজে শৈথিল্য আনে, ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চকমকির ঠোকাঠুকি-শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ-নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান্ মনে করা বর্ব্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের

পথে, ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে "ফ্রীডাম্"বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্ব্বল, ভীরু, তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,—তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে! তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে-চর্ম্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডাম্" কোনকালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্যসকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক-কালের ধিক্কারসত্ত্বেও এই "ফ্রীডাম্" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডামের চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়-বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ, পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিসলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন, এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষিকবিরা ত্রিষ্টুভ্ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ-চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্য্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনু-

ভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণজীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার করা ফুলে-পাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচিরপ্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল, নবসৌন্দর্য্য, আমরা যদি অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, তবে দুইদণ্ডবাদেই তাহা কদর্য্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্প-পত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা-ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন, শ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ, তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিবে—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি আশীর্ব্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক্, তাহারই জয় হইবে,—আমরা—যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

"মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।"

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট্-ফ্রক্ পরাইয়া দিয়া

বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন .

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

আমাদের দেশে রাজা ছিলেন সমাজের একটি অঙ্গ। ব্রাহ্মণ গুরুগণও একভাবে সমাজরক্ষা-ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজারাও অন্যভাবে সেই কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। দেশরক্ষা গৌণ, কিন্তু দেশের ধর্ম্মরক্ষাই তাঁহাদের মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল। ভারতবর্ষে সাধারণত রাজা সমস্ত দেশকে গ্রাস করেন নাই। তাঁহারা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থান সীমাবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেইজন্য রাজার অভাবে ভারতীয় সমাজ অঙ্গহীন হইত, দুর্ব্বল হইত, তবু মরিত না। যেমন এক চক্ষুর অভাবে অন্য চক্ষু দিয়া দৃষ্টি চলে, তেমনি স্বদেশী রাজার অভাবেও সমাজের কাজ চলিয়া গেছে।

বিদেশী রাজা আর সমস্ত অধিকার করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক সিংহাসনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজই ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থান; সেই সমাজের সহিত বিদেশী রাজার নাড়ীর সম্বন্ধ না থাকাতে যথার্থ ভারতবর্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ।

সকল দেশেই বিদেশী রাজা দেশের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—ভারতবর্ষে আরো বেশি। কারণ, ভারতবর্ষীয় সমাজ দুর্গের ন্যায় দৃঢ় প্রাকারের দ্বারা আপনাকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী অনাত্মীয় তাহার মধ্যে অবারিত পথ পায় না। এইজন্য বিদেশী সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত ভারত-ইতিবৃত্তের অতি সামান্য অংশ—তাহা পরিশিষ্টভাগে লিখিত হইবার যোগ্য।

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি-মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্ত্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে, যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল যাহারা কাটাকাটি-খুনাখুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দ্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জ্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না,—সে দিনও সেই ধুলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধুলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধুলির কথা—ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জ্জনমুখর বাত্যাবর্ত্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই সমস্ত

উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে—কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্ত্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি—বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্ব্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন, আচারব্যবহার, সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যে সকল দেশ ভাগ্যবান্‌, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়—বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জ্জনের সাম্রাজ্যগর্ব্বোদগারকাল পর্য্যন্ত

যে কিছু ইতিহাসকথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশসম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিক্‌টাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্ত্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদ্‌সাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত-নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়—সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্ম্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মস্‌জিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন—এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে—সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল চাতুরী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা সতরঞ্চের মত ইংরাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র;—বস্তুত সতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয়-শাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরোআনাই শাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন, সুবিচার, সুশিক্ষা, সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যা-

ওয়ে-লেড্‌ল-র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি—আর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্য্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরাণীশালার এককোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জ্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসসম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিষ্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃষ্টের হিসাবে খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক্ হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া, আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব্ব হইতেছি। ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে, সে-ও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব, রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের

পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই—এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কি করিব, তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়।

ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কি, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কি, দেশের মূল মর্ম্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কি করিয়া?

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই

উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বাভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল্ উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। যুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক। যুরোপীয় পোলিটিক্যাল্ ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্ব্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে, তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল—যাহাতে কোন পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া

যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে, সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না—সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, উদ্যম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে—এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিরোধ যাহার বীজ, বিরোধই তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বিরোধশস্যেরই প্রাণবান্ বলবান্ বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহারের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক্ অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্ব্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসীবিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, এমন স্পর্দ্ধা করিয়াছিল—কিন্তু ফল উল্টা হইয়াছে—য়ুরোপে রাজশক্তি-প্রজাশক্তি, ধনশক্তি-জনশক্তি, ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্রকর্ম্মের উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে

ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্ত্তিত, আবিল, উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্য-নির্ণয়, মিলনসাধন, এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্য যে শক্তি পাইয়াছে, সেই শক্তি চর্চ্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মত ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত-স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ্ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিয়ুজীলাণ্ড, কেপ্‌কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই—তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ, তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার

মত হইয়াছে—এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত, সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুইরকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্ম্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। শেক্‌স্‌পিয়র কোথা হইতে কি আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা সন্ধান করিতে বসিলে নানা ভাণ্ডারেই তাঁহার প্রবেশাধিকার আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আপনার করিবার শক্তি ছিল বলিয়াই তিনি এত লইতে পারিয়াছেন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে-

নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্ম্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ-সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন্ বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব—কারণ ভারতবর্ষ ধর্ম্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনটাকে পোষাকী এবং কোনটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের, জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়, বিশ্বাসের ধর্ম্ম, আচরণের ধর্ম্ম, রবিবারের ধর্ম্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম্ম, গির্জ্জার ধর্ম্ম এবং গৃহের ধর্ম্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন

ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্ত্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ লোপ পাইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্ত্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি সেই সেতু নির্ম্মিত হয়, তবে এই দ্বিধারও সফলতা আছে—কারণ বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না। যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকে, তবে বিদেশ আমাদিগকে যে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে স্বদেশকেই আমরা নিবিড়তররূপে উপলব্ধি করিব। প্রবাসে নির্ব্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে।

মামুদ ও মহম্মদঘোরীর বিজয়বার্ত্তার সমস্ত তারিখ আমরা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবেন, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠাদান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাসকে অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে, পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে; আমরা কেবল গ্রহণ করিব না—অনুকরণ করিব না, দান করিব—প্রবর্ত্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে; পলিটিক্স এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে, প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের পথে বৈরাগ্য-কঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য্য করিয়া দুর্গম-নির্ম্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার

জন্ত আমাদের ঋষি-পিতামহদের সুগম্ভীর নিদেশ-নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ; সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্ত কোন পান্থ নাই বলিয়া আমরা ফিরিব না, গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশয় সে পথে চলিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত হইব না। মূল্য না দিলে কোন মূল্যবান্ জিনিষকে আপনার করা যায় না। ভিক্ষা করিতে গেলে কেবল খুদকুঁড়া মেলে, তাহাতে পেট অল্পই ভরে, অথচ জাতিও থাকে না। বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না ; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না, সঙ্কোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত হইয়া থাকে। যখন গৌরবসহকারে দিব, তখন গৌরব সহকারে লইব। হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সঙ্গতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন কর। তাহার পর হইতে আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি বাধাহীন ও অকুণ্ঠিত হইবে, আমাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অকৃত্রিম ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইংরাজ নিজেকে সর্ব্বত্র প্রসারিত, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত করাকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, তাহাদের বুদ্ধিবিচারের এই উন্মত্ত অন্ধ অবস্থায় তাহারা ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। উপনিষদে অনুশাসন আছে—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্—শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না—কারণ, শ্রদ্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিষ দেওয়াই যায় না, বরঞ্চ এমন একটা জিনিষ দেওয়া হয়, যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়। আজকালকার ইংরাজশিক্ষকগণ দানের দ্বারা আমাদিগকে হীন করিয়া থাকেন,—তাঁহারা অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার সহিত দান করেন, সেই সঙ্গে প্রত্যহ সবিদ্রূপে স্মরণ করাইতে থাকেন—"যাহা দিতেছি, ইহার তুল্য

তোমাদেরর কিছুই নাই এবং যাহা লইতেছ, তাহার প্রতিদান দেওয়া তোমাদের সাধ্যের অতীত।” প্রত্যহ এই অবমাননার বিষ আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে পক্ষাঘাত আনিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়। শিশুকাল হইতেই নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করিবার কোন অবকাশ—কোন সুযোগ পাই নাই, পরভাষার বানান-বাক্য-ব্যাকরণ ও মতামতের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত-অভিভূত হইয়া আছি—নিজের কোন শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। ইংরেজের নিজের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ নহে—অক্স্‌ফোর্ড্‌-কেম্ব্রিজে তাঁহাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে, তাহা নহে, তাহারা আলোক, আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাহাদের সুদূর কলের সম্বন্ধ নহে। একে ত তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী স্বদেশী সমাজ স্বদেশী শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আপন করিয়া লইবার জন্য শিশুকাল হইতে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহার পরে শিক্ষাপ্রণালী ও অধ্যাপকগণও অনুকূল। আমাদের আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রতিকূল—যাহা শিখি, তাহা প্রতিকূল, যে উপায়ে শিখি, তাহা প্রতিকূল, যে শেখায়, সে-ও প্রতিকূল। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু লাভ করিয়া থাকি, যদি এ শিক্ষা আমরা কোন কাজে খাটাইতে পারি, তাহা আমাদের গুণ।

অবশ্য এই বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশীয় প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগরক্ষা করিয়া, স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে, তাহাকে

নিজের বা পরের ইচ্ছামত বিকৃত করিলে, আমরা জগতে নিস্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণপরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিষকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিষ বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। একদিন এইরূপ গুরু আমাদের দেশে গ্রামে-গ্রামেই ছিলেন—তাঁহাদের জুতামোজা, গাড়িঘোড়া, আস্‌বাব্‌পত্রের প্রয়োনজই ছিল না—নবাব ও নবাবের অনুকারিগণ তাঁহাদের চারিদিকে নবাবী করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাঁহাদের দৃক্‌পাত ছিল না, তাঁহাদের অগৌরব ছিল না। এখনো আনাদের দেশে সেই সকল গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এখন ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায় আমাদের জঠরানলনির্ব্বাণের সহায়তা করে না এবং আধুনিক কালের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নূতন শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের চাল বিগ্‌ড়াইয়া গেছে, তাঁহাদের আদর্শ বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, বিদ্যাদানকে তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া জানেন না, বিদ্যাকে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য করিয়া বিদ্যাকেও হীন করিয়াছেন, নিজেকেও হেয় করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শের এই বিপর্য্যয়দশা একদিন সংশোধিত হইবে—ইহা আমি দুরাশা বলিয়া গণ্য করি না। আমাদের বৃহৎ-শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন দুই-চারিটি লোক নিশ্চয়ই উঠিবেন, যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিক ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জীবনযাত্রার উপকরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া, দেশের

স্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্‌স্পেক্টরের গর্জ্জন ও য়ুনিভারসিটির তর্জ্জন বর্জ্জিত সেই সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতালাভ করিবে, মর্য্যাদালাভ করিবে। ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতর জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ।

সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরাজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ঘটনাটা এতই লজ্জাকর যে, মাসিকপত্রে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। মার খাইয়া মারা উচিত বা ক্রন্দন করা উচিত বা নালিশ করা উচিত, সে সমস্ত আলোচনা খবরের কাগজে হইয়া গেছে—সে সকল কথাও আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল গুরুতর চিন্তার বিষয় আমাদের মনে উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত!

বিচারক এই ঘটনাটিকে তুচ্ছ বলেন—কাজেও দেখিতেছি ইহা তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তিনি অন্যায় বলেন নাই। কিন্তু এই ঘটনাটি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হওয়াতেই বুঝিতেছি, আমাদের সমাজের বিকার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইংরাজ যাহাকে প্রেষ্টীজ্ অর্থাৎ তাঁহাদের রাজসম্মান বলেন, তাহাকে মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কারণ, এই প্রেষ্টীজের জোর

অনেক সময়ে সৈন্যের কাজ করে। যাহাকে চালনা করিতে হইবে, তাহার কাছে প্রেষ্টীজ্ রাখা চাই। বোয়ারযুদ্ধের আরম্ভকালে ইংরাজ-সাম্রাজ্য যখন স্বল্পপরিমিত কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে বারবার অপমানিত হইতেছিল, তখন ইংরাজ ভারতবর্ষের মধ্যে যত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, এমন আর কোথাও নহে। তখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিলাম, ইংরাজের বুট এ দেশে পূর্ব্বের ন্যায় তেমন অত্যন্ত জোরে মচ্‌মচ্ করিতেছে না।

আমাদের দেশে এককালে ব্রাহ্মণের তেমনি একটা প্রেষ্টীজ্ ছিল। কারণ, সমাজচালনার ভার ব্রাহ্মণের উপরেই ছিল। ব্রাহ্মণ যথারীতি এই সমাজকে রক্ষা করিতেছেন কি না এবং সমাজরক্ষা করিতে হইলে যে সকল নিঃস্বার্থ মহদ্‌গুণ থাকা উচিত, সে সমস্ত তাঁহাদের আছে কি না, সে কথা কাহারো মনেও উদয় হয় নাই—যতদিন সমাজে তাঁহাদের প্রেষ্টীজ্ ছিল। ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রেষ্টীজ্ যেরূপ মূল্যবান্, ব্রাহ্মণের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেষ্টীজ্ সেইরূপ।

আমাদের দেশে সমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে। আবশ্যক আছে বলিয়াই সমাজ এত সম্মান ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল।

আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার। ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশাল লোকসম্প্রদায়কে অপরাধ হইতে, স্খলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যদি এরূপ না হইত, তবে ইংরাজ তাঁহার পুলিশ ও ফৌজের দ্বারা এত-বড় দেশে এমন আশ্চর্য্য শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন না। নবাব-বাদশাহের আমলেও নানা রাজকীয় অশান্তি-সত্ত্বেও সামাজিক শান্তি চলিয়া আসিতেছিল,—তখনো লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদানপ্রদানে সততা রক্ষিত হইত, মিথ্যা সাক্ষ্য

নিন্দিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্ম্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত।

সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবারও বিধিবিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্য্য সাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।

প্রাচ্যপ্রকৃতির অনুগত এইপ্রকার সমাজবিধানকে যদি নিন্দনীয় বলিয়া না মনে করা যায়, তবে ইহার আদর্শকে চিরকাল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং ইহার শৃঙ্খলাস্থাপন করিবার ভার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর সমর্পণ করিতেই হয়। তাঁহারা জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া, অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজন-যাজনকেই ব্রত করিয়া দেশের উচ্চতম আদর্শকে সমস্ত দোকানদারীর কলুষস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক যে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার যথার্থ অধিকারী হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

যথার্থ অধিকার হইতে লোক নিজের দোষে ভ্রষ্ট হয়। ইংরাজের বেলাতেও তাহা দেখিতে পাই। দেশী লোকের প্রতি অন্যায় করিয়া যখন প্রেষ্টিজ্‌রক্ষার দোহাই দিয়া ইংরাজ দণ্ড হইতে অব্যাহতি চায়, তখন যথার্থ প্রেষ্টিজের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। ন্যায়পরতার প্রেষ্টিজ্‌ সকল প্রেষ্টিজের বড়—তাহার কাছে আমাদের মন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাথা নত করে—বিভীষিকা আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া নোয়াইয়া দেয়, সেই প্রণতি-অবমাননার বিরুদ্ধে আমাদের মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মণও যখন আপন কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

কোন সম্মান বিনামূল্যের নহে—যথেচ্ছ কাজ করিয়া সম্মান রাখা

যায় না। যে রাজা সিংহাসনে বসেন, তিনি দোকান খুলিয়া ব্যবসা চালাইতে পারেন না। সম্মান যাঁহার প্রাপ্য, তাঁহাকেই সকল দিকে সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিয়া চলিতে হয়। গৃহের অন্যান্য লোকের অপেক্ষা আমাদের দেশে গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীকেই সাংসারিক বিষয়ে অধিক বঞ্চিত হইতে হয়—বাড়ীর গৃহিণীই সকলের শেষে অন্ন পান। ইহা না হইলে আত্মম্ভরিতার উপর কর্ত্তৃত্বকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। সম্মানও পাইবে, অথচ তাহার কোন মূল্য দিবে না, ইহা কখনই চিরদিন সহ্য হয় না।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণেরা বিনামূল্যে সম্মান-আদায়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সম্মান আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর মৌখিক হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে কর্ম্মে শৈথিল্য ঘটাতে সমাজেরও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজরক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার আশ্রমধর্ম্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।

যে সমাজের একদল ধনমানকে অবজ্ঞা করিতে জানেন, বিলাসকে ঘৃণা করেন, যাহাদের আচার নির্ম্মল, ধর্ম্মনিষ্ঠা দৃঢ়, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান অর্জ্জন ও নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণে রত—পরাধীনতা বা দারিদ্র্যে সে সমাজের কোন অবমাননা নাই। সমাজ যাঁহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে, সমাজ তাঁহার দ্বারাই সম্মানিত হয়।

সকল সমাজেই মান্যব্যক্তিরা—শ্রেষ্ঠ লোকেরাই নিজ নিজ সমাজের স্বরূপ। ইংলণ্ডকে যখন আমরা ধনী বলি, তখন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। য়ুরোপকে যখন আমরা স্বাধীন বলি, তখন তাহার বিপুল জনসাধারণের দুঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেখানে উপরের কয়েকজন লোকই ধনী, উপরের কয়েকজন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েকজন লোকই পাশবতা হইতে মুক্ত। এই উপরের কয়েকজন লোক যতক্ষণ নিম্নের বহুতর লোককে সুখস্বাস্থ্য জ্ঞানধর্ম্ম দিবার জন্য সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ ও নিজের সুখকে নিয়মিত করে, ততক্ষণ সেই সভ্যসমাজের কোন ভয় নাই।

য়ুরোপীয় সমাজ এই ভাবে চলিতেছে কি না, সে আলোচনা বৃথা মনে হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা নহে।

যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নায় পাশের লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত্তে লড়াই করিতে হইতেছে, সেখানে কর্ত্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখা কঠিন। এবং সেখানে কোন একটা সীমায় আসিয়া আশাকে সংযত করাও লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়।

য়ুরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। এমন কথাও কাহারো মনে আসে না যে, বরঞ্চ জলে স্থলে সৈন্যসজ্জা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিবেশীর কাছে লাঘব স্বীকার করিব, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সুখসন্তোষ ও জ্ঞানধর্ম্মের বিস্তার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতার আকর্ষণে যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে উদ্দামভাবে চালাইয়া লইয়া

যায়—এবং এই দুর্দ্দান্তগতিতে চলাকেই য়ুরোপে উন্নতি কহে, আমরাও তাহাকেই উন্নতি বলিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু যে চলা পদে পদে থামার দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে ছন্দে যতি নাই, তাহা ছন্দই নহে। সমাজের পদমূলে সমুদ্র অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির চিরন্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজমান থাকা চাই।

সেই আদর্শকে কাহারা অটলভাবে রক্ষা করিতে পারে? যাহারা পুরুষানুক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্র্যেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্ম্মকে যাহারা পণ্যদ্রব্যের মত দেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্ম্মের মধ্যে যাহাদের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজ করে, এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহত্ত্বারই যাঁহাদিগকে পবিত্র ও পূজনীয় করিয়াছে।

য়ুরোপেও অবিশ্রাম কর্ম্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক একজন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণাগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুইদণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের দুইএকজন লোক তর্জ্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কি করিয়া? বাণিজ্য-জাহাজে উনপঞ্চাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারিসারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?

এই উন্মত্ততায়, এই প্রাণপণে নিজশক্তির একান্ত উদ্‌ঘট্টনে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হইতে পারে, এমন তর্ক আমাদের মনেও ওঠে। এই বেগের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশী, ইহা আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, ইহা যে প্রলয়ের দিকে যাইতে পারে, এমন সন্দেহ আমাদের হয় না।

ইহা কি প্রকারের? যেমন চীরধারী যে একটি দল নিজেকে সাধু ও সাধক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা গাঁজার নেশাকে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সাধনা বলিয়া মনে করে। নেশার একাগ্রতা জন্মে, উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক স্বাধীন সবলতা হ্রাস হইতে থাকে। আর সমস্ত ছাড়া যায়, কিন্তু এই নেশার উত্তেজনা ছাড়া যায় না—ক্রমে মনের বল যত কমিতে থাকে, নেশার মাত্রাও তত বাড়াইতে হয়। ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বা সশব্দে বাদ্য বাজাইয়া, নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত করিয়া যে ধর্ম্মোন্মাদের বিলাস সম্ভোগ করা যায়, তাহাও কৃত্রিম। তাহাতে অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা অহিফেনের নেশার মত আমাদিগকে অবসাদের সময় কেবলি তাড়না করিতে থাকে। আত্মসমাহিত শান্ত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত যথার্থ স্থায়ী মূল্যবান্ কোন জিনিষ পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মূল্যবান্ কোন জিনিষ রক্ষা করা যায় না।

অথচ আবেগ ব্যতীত কাজ ও কাজ ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। এইজন্যই ভারতবর্ষ আপন সমাজে গতি ও স্থিতির সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি যাহারা হাতে-কলমে সমাজের কার্য্যসাধন করে, তাহাদের কর্ম্মের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইজন্যই ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিতে পারিত। স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ধর্ম্মের উপরে কর্ত্তব্যস্থাপন করিলে, কাজের মধ্যেও বিশ্রাম এবং আধ্যাত্মিকতালাভের অবকাশ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় সমাজ যে নিয়মে চলে, তাহাতে গতিজনিত বিশেষ একটা ঝোঁকের মুখেই অধিকাংশ লোককে ঠেলিয়া দেয়। সেখানে বুদ্ধিজীবী লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই ঝুঁকিয়া পড়ে—সাধারণ লোকে অর্থোপার্জ্জনেই ভিড় করে। বর্ত্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে

গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে। এমন সময় হওয়া বিচিত্র নহে, যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা যথেষ্ট লোককে আকর্ষণ করিবে না। এমন সময় আসিতে পারে, যখন আবশ্যক হইলেও সৈন্য পাওয়া যাইবে না। কারণ, প্রবৃত্তিকে কে ঠেকাইবে? যে জর্ম্মণী একদিন পণ্ডিত ছিল, সে জর্ম্মণী যদি বণিক্ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পাণ্ডিত্য উদ্ধার করিবে কে? যে ইংরাজ একদিন ক্ষত্রিয়ভাবে আর্ত্তত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, সে যখন গায়ের জোরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নিজের দোকানদারী চালাইতে ধাবিত হইয়াছে—তখন তাহাকে তাহার সেই পুরাতন উদার ক্ষত্রিয়ভাবে ফিরাইয়া আনিবে কোন্ শক্তিতে?

এই ঝোঁকের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব না দিয়া সংযত সুশৃঙ্খল কর্ত্তব্যবিধানের উপরে কর্ত্তৃত্বভার দেওয়াই ভারতবর্ষীয় সমাজপ্রণালী। সমাজ যদি সজীব থাকে, বাহিরের আঘাতের দ্বারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, তবে এই প্রণালী অনুসারে সকল সময়েই সমাজে সামঞ্জস্য থাকে—একদিকে হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্যদিক্ শূন্য হইয়া যায় না। সকলেই আপন আদর্শ রক্ষা করে এবং আপন কাজ করিয়া গৌরব বোধ করে।

কিন্তু কাজের একটা বেগ আছেই। সেই বেগে সে আপনার পরিণাম ভুলিয়া যায়। কাজ তখন নিজেই লক্ষ হইয়া উঠে। শুদ্ধমাত্র কর্ম্মের বেগের মুখে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সুখ আছে। কর্ম্মের ভূত কর্ম্মী লোককে পাইয়া বসে।

শুদ্ধ তাহাই নহে। কার্য্যসাধনই যখন অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, তখন উপায়ের বিচার ক্রমেই চলিয়া যায়। সংসারের সহিত, উপস্থিত আবশ্যকের সহিত কর্ম্মীকে নানাপ্রকারে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

অতএব যে সমাজে কর্ম্ম আছে, সেই সমাজেই কর্ম্মকে সংযত রাখিবার বিধান থাকা চাই—অন্ধ কর্ম্মই যাহাতে মনুষ্যত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব

লাভ না করে, এমন সতর্ক পাহারা থাকা চাই। কর্ম্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এমন এক দলের আবশ্যক, যাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ, সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি। ইঁহারা যে সমাজে আপনাকে মুক্তভাবে রাখেন, ক্ষুদ্র পরাধীনতায় সে সমাজের কোন ভয় নাই, বিপদ্ নাই। ব্রাহ্মণ-অংশের মধ্যে সে সমাজ সর্ব্বদা আপনার মনের, আপনার আত্মার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ যদি দৃঢ়ভাবে, উন্নতভাবে, অলুব্ধভাবে সমাজের এই পরমধনটি রক্ষা করিতেন, তবে ব্রাহ্মণের অবমাননা সমাজ কখনই ঘটিতে দিত না এবং এমন কথা কখনই বিচারকের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণকে পাদুকাঘাত করা তুচ্ছ ব্যাপার। বিদেশী হইলেও বিচারক মানী ব্রাহ্মণের মান আপনি বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সাহেবের আফিসে নত মস্তকে চাকৃরি করে—যে ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান্ অধিকারকে বিসর্জ্জন দেয়—যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক্, বিচারালয়ে বিচার-ব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্ত্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্ম্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে ত সর্ব্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি-ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গেছে। ভক্তির

দ্বারা সে ব্রাহ্মণত্ব সমাজকে উর্দ্ধে আকৃষ্ট করে না—নিম্নেই লইয়া যায়।

এ কথা জানি, কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই কোনকালে আপনার ধর্ম্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে না, অনেকে স্খলিত হয়। অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছে, পুরাণে এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু তবু যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ সজীব থাকে, ধর্ম্মপালনের চেষ্টা থাকে, কেহ আগে যাক্ কেহ পিছাইয়া পড়ুক, কিন্তু সেই পথের পথিক যদি থাকে, যদি এই আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টার দ্বারা, সেই সাধনার দ্বারা, সেই সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমস্ত সম্প্রদায় সার্থক হইয়া থাকে।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজে সেই আদর্শই নাই। সেইজন্যই ব্রাহ্মণের ছেলে ইংরাজি শিখিলেই ইংরাজি কেতা ধরে—পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না। কেন? এম্-এ-পাস-করা মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানবিৎ চট্টোপাধ্যায় যে বিদ্যা পাইয়াছেন, তাহা ছাত্রকে ঘরে ডাকিয়া আসন হইয়া বসিয়া বিতরণ করিতে পারেন না; সমাজকে শিক্ষাঋণে ঋণী করিবার গৌরব হইতে কেন তাঁহারা নিজেকে ও ব্রাহ্মণসমাজকে বঞ্চিত করেন?

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, খাইব কি? যদি কালিয়া-পোলোয়া না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। তাঁহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না, পায়ে ধরিয়া সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। আজ তাঁহারা বেতনের জন্য হাত পাতেন, সেইজন্য সমাজ রসিদ লইয়া টিপিয়া-টিপিয়া তাঁহাদিগকে বেতন দেয় ও কড়ায়-গণ্ডায় তাঁহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়। তাঁহারাও কলের মত বাঁধা নিয়মে কাজ করেন; শ্রদ্ধা

দেনও না, শ্রদ্ধা পানও না—উপরন্তু মাঝে মাঝে সাহেবের পাদুকা পৃষ্ঠে বহনকরা-রূপ অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনায় সুবিখ্যাত উপলক্ষ্য হইয়া উঠেন।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে, এ সম্ভাবনাকে আমি সুদূরপরাহত মনে করি না এবং এই আশাকে আমি লঘুভাবে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চিরকালের প্রকৃতি তাহার ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবেই।

এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজের কাজে অব্রাহ্মণ অনেকেও যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ ছিলেন না, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও দ্বিজসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভের দ্বারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের উপনয়ন হইত, তখনই এ দেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কারণ, চারিদিকের সমাজ যখন অবনত, তখন কোন বিশেষ সমাজ আপনাকে উন্নত রাখিতে পারে না, ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ অবশিষ্ট রহিল, যখন তাহার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, তাহার নিকট ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিবার জন্য চারিদিকে আর কেহই রহিল না, তখন তাহার দ্বিজত্বের বিশুদ্ধ কঠিন আদর্শ দ্রুতবেগে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তখনি সে জ্ঞানে, বিশ্বাসে, রুচিতে ক্রমশ নিকৃষ্ট অধিকারীর দলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, চারিদিকে যেখানে গোলপাতার কুঁড়ে, সেখানে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে একটা আটচালা বাঁধিলেই যথেষ্ট—সেখানে সাতমহল প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিয়া তুলিবার ব্যয় ও চেষ্টা স্বীকার করিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জন্মে।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজ ছিল, অর্থাৎ সমস্ত আর্য্য সমাজই দ্বিজ ছিল—শূদ্র বলিতে যে সকল লোককে বুঝাইত, তাহারা সাঁওতাল, ভিল, কোল, ধাঙড়ের দলে ছিল। আর্য্যসমাজের সহিত তাহাদের শিক্ষা, রীতিনীতি ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ঐক্যস্থাপন একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ সমস্ত আর্য্যসমাজই দ্বিজ ছিল—অর্থাৎ সমস্ত আর্য্যসমাজের শিক্ষা একইরূপ ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল কর্ম্মে। শিক্ষা একই থাকায় পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের বিশুদ্ধিরক্ষায় সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে পারিত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইতে সাহায্য করিত, এবং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হইতে সাহায্য করিত। সমস্ত সমাজের শিক্ষার আদর্শ সমান উন্নত না হইলে, এরূপ কখনই ঘটিতে পারে না।

বর্ত্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না, এবং সমাজকে সর্ব্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভদ্রসম্প্রদায়—অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ ও বণিক্ সম্প্রদায়—সমাজ যদি ইঁহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া গণ্য না করে, তবে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই। একপায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।

বৈদ্যেরা ত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কায়স্থেরা বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য—এ

কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। আকার-প্রকার, বুদ্ধি ও ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্য্যত্বের লক্ষণে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশের যে কোন সভায় পৈতা না দেখিলে, ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতিদের তফাৎ করা অসম্ভব। কিন্তু যথার্থ অনার্য্য, অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বন্যজাতির সহিত তাঁহাদের তফাৎ করা সহজ। বিশুদ্ধ আর্য্যরক্তের সহিত অনার্য্যরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা আমাদের বর্ণে, আকৃতিতে, ধর্ম্মে, আচারে ও মানসিক দুর্ব্বলতায় স্পষ্ট বুঝা যায়—কিন্তু সে মিশ্রণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়াছে।

তথাপি, এই মিশ্রণ এবং বৌদ্ধযুগের সামাজিক অরাজকতার পরেও সমাজ ব্রাহ্মণকে একটা বিশেষ গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে নহিলে তাহার সকল দিকেই বাধে, আত্মরক্ষার জন্য যেমন-তেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই। আধুনিক ইতিহাসে এমনও দেখা যায়, কোন কোন স্থানে বিশেষ প্রয়োজনবশত রাজা পৈতা দিয়া একদল ব্রাহ্মণ তৈরি করিয়াও লইয়াছেন। বাংলাদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা আচারে, ব্যবহারে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছিলেন, তখন রাজা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সমাজের কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যখন চারিদিকের প্রভাবে নত হইয়া পড়িতেছিল, তখন রাজা কৃত্রিম উপায়ে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নির্ব্বাণোন্মুখ মর্য্যাদাকে খোঁচা দিয়া জাগাইতেছিলেন। অপর পক্ষে, কৌলীন্যে বিবাহসম্বন্ধে যেরূপ বর্ব্বরতার সৃষ্টি করিল, তাহাতে এই কৌলীন্যই বর্ণমিশ্রণের এক গোপন উপায় হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মরক্ষার জন্য, বিশেষ আবশ্যকতাবশতই সমাজ বিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া

রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়বৈশ্যদিগকে সেরূপ বিশেষভাবে তাহাদের পূর্ব্বতন আচারকাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ করিবার কোন অত্যাবশ্যকতা বাংলাসমাজে ছিল না। যে খুসি যুদ্ধ করুক্, বাণিজ্য করুক্, তাহাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসিত-যাইত না—এবং যাহারা যুদ্ধ-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদিগকে বিশেষ চিহ্নের দ্বারা পৃথক্ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসায় লোকে নিজের গরজেই করে, কোন বিশেষ ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে না—ধর্ম্মসম্বন্ধে সে বিধি নহে; তাহা প্রাচীন নিয়মে আবদ্ধ, তাহার আয়োজন, রীতি-পদ্ধতি আমাদের স্বেচ্ছাবিহিত নহে।

অতএব জড়ত্বপ্রাপ্ত সমাজের শৈথিল্যবশতই একসময়ে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একাকার হইয়া গেছে। তাঁহারা যদি সচেতন হন, যদি তাঁহারা নিজের অধিকার যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, নিজের গৌরব যথার্থভাবে প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হন, তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গল, ব্রাহ্মণদের পক্ষে মঙ্গল।

ব্রাহ্মণদিগকে নিজের যথার্থ গৌরব লাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি যাইতে হইবে; ব্রাহ্মণ কেবল একলা যাইবে এবং আর সকলে যে যেখানে আছে, সে সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের এক দিকে গতি না হইলে তাহার কোন এক অংশ সিদ্ধিলাভ করিতেই পারে না। যখন দেখিব, আমাদের দেশের কায়স্থ ও বণিক্‌গণ আপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজের সহিত যুক্ত করিয়া বৃহৎ হইবার, বহু পুরাতনের সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতকে সম্মিলিত করিয়া আমাদের জাতীয় সত্তাকে অবিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন,

তখনই জানিব, আধুনিক ব্রাহ্মণও প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমাজকে সজীবভাবে যথার্থভাবে, অখণ্ডভাবে এক করিবার কার্য্যে সফল হইবেন। নহিলে কেবল স্থানীয় কলহ-বিবাদ-দলাদলি লইয়া বিদেশী প্রভাবের সাংঘাতিক অভিঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, নহিলে ব্রাহ্মণের সম্মান অর্থাৎ আমাদের সমস্ত সমাজের সম্মান ক্রমে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম হইয়া আসিবে।

আমাদের সমস্ত সমাজ প্রধানতই দ্বিজসমাজ ; ইহা যদি না হয়, সমাজ যদি শূদ্রসমাজ হয়, তবে কয়েকজনমাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ য়ুরোপীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে।

সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবী করিয়া থাকে, আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত্ব-সুখ-ভোগে যে সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে, সে সমাজ মরে, এবং না-ও যদি মরে, তবে তাহার মরাই ভাল।

য়ুরোপ কর্ম্মের উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত—আমরা যদি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই, তবে সে প্রাণ অপমানিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।

য়ুরোপীয় সৈন্য যুদ্ধানুরাগের উত্তেজনায় ও বেতনের লোভে ও গৌরবের আশ্বাসে প্রাণ দেয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় উত্তেজনা ও বেতনের অভাব ঘটিলেও যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ, যুদ্ধ সমাজের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, এক সম্প্রদায় যদি নিজের ধর্ম্ম বলিয়াই সেই কঠিন কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করেন, তবে কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মরক্ষা হয়। দেশসুদ্ধ সকলে মিলিয়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে মিলিটারিজ্‌মের প্রাবল্যে দেশের গুরুতর অনিষ্ট ঘটে।

বাণিজ্য সমাজরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্ম্ম। সেই সামাজিক

আবশ্যকপালনকে এক সম্প্রদায় যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, আপন কৌলিক গৌরব বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে বণিগ্‌বৃত্তি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অন্যান্য শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে না। তা ছাড়া কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে।

ধর্ম্ম এবং জ্ঞানার্জ্জন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য্য, বাণিজ্য এবং শিল্পচর্চ্চা, সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম্ম। ইহার কোনটাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্ম্মগৌরব, কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষসাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।

কর্ম্মের উত্তেজনাই পাছে কর্ত্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল। তাই ভারতবর্ষে সামাজিক মানুষটি লড়াই করে, বাণিজ্য করে, কিন্তু নিত্যমানুষটি—সমগ্র মানুষটি শুদ্ধমাত্র সিপাই নহে, শুদ্ধমাত্র বণিক্ নহে। কর্ম্মকে কুলব্রত করিলে, কর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে, তবে কর্ম্মসাধনও হয়, অথচ সেই কর্ম্ম আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সমাজের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিয়া, মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া, আত্মার রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে না।

যাঁহারা দ্বিজ, তাঁহাদিগকে একসময় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন—তখন তাঁহারা নিত্যকালের মানুষ—তখন কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে আর ধর্ম্ম নহে, সুতরাং অনায়াসে অপরিহার্য্য। এইরূপে দ্বিজসমাজ বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিবে। এই চঞ্চল সংসারই মৃত্যুনিকেতন, ইহাই অবিদ্যা—ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহার ভিতর

দিয়াই যাইতে হয়—কিন্তু এমনভাবে যাইতে হয়, যেন ইহাই চরম না হইয়া উঠে। কর্ম্মকেই একান্ত প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইয়া উঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, অমৃত লাভ করিবার লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশই থাকে না। এইজন্যই কর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্ম্মকে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করা, কর্ম্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে, কর্ম্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া; এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্ম্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করা।

ইহাই আদর্শ। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্ম্মের নানাপাশ শিথিল করিয়া তাহাকে একদিকে সংসারব্রতপরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্য কোন উপায় ত দেখি না। এই আদর্শ উন্নততম আদর্শ এবং ভারতবর্ষের আদর্শ। এই আদর্শে বর্ত্তমান সমাজকে সাধারণভাবে অধিকৃত ও চালিত করিবার উপায় কি, তাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া কর্ম্মকে ও প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া তোলা—সেজন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। সমাজের সে অবস্থা জড়ত্বের দ্বারা, শৈথিল্যের দ্বারা আপনি আসিতেছে।

বিদেশী শিক্ষার প্রাবল্যে, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায় এই ভারতবর্ষীয় আদর্শ সত্বর এবং সহজে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিতে পারিবে না, ইহা আমি জানি। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শ অবলম্বন করাই যে আমাদের পক্ষে সহজ, এ দুরাশাও আমার নাই। সর্ব্বপ্রকার আদর্শ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—এবং সেই সহজ পথই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এমন একটা আল্‌গা জিনিষ নহে যে, তাহা পাকা ফলটির মত পাড়িয়া লইলেই কবলের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে।

সকল পুরাতন ও বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই বিনাশ ও রক্ষার একটি সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ তাহার যে শক্তি বাড়াবাড়ি করিয়া মরিতে চায়, তাহার অন্যশক্তি তাহাকে সংযত করিয়া রক্ষা করে। আমাদের শরীরেও যন্ত্রবিশেষের যতটুকু কাজ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত অনিষ্টকর, সেই কাজটুকু আদায় করিয়া সেই অকাজটুকুকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরতন্ত্রে রহিয়াছে; পিত্তের দরকারটুকু শরীর লয়, অদরকারটুকু বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে থাকে।

এই সকল সুব্যবস্থা অনেকদিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা উৎকর্ষলাভ করিয়া সমাজের শারীরবিধানকে পরিণতি দান করিয়াছে। আমরা অন্যের নকল করিবার সময় সেই সমগ্র স্বাভাবিক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং অন্য সমাজে যাহা ভাল করে, নকলকারীর সমাজে তাহাই মন্দের কারণ হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় মানবপ্রকৃতি সুদীর্ঘকালের কার্য্যে যে সভ্যতাবৃক্ষটীকে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দুটো-একটা ফল চাহিয়া-চিন্তিয়া লইতে পারি, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষকে আপনার করিতে পারি না। তাহাদের সেই অতীত কাল আমাদের অতীত।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যদি-বা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তবু সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না,—সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারংবার অসঙ্গত ও অকৃতকার্য্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যখন আমরা নূতনকে আনি, তখন অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়—নূতনকে বিনাশ করিয়া পচাইয়া বায়ু দূষিত করিয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি, এইটে আমাদের নূতন দরকার, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আপোষে যদি রফা-নিষ্পত্তি না করিয়া লইতে পারি, তবে আবশ্যকের দোহাই পাড়িয়াই

যে দেউড়ি খোলা পাইব, তাহা কিছুতেই নহে। নূতনটাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও, নূতনে-পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়।

সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে। শুষ্কভাবে শুদ্ধ বিচারবিতর্কের দ্বারা সে প্রাণসঞ্চার হইতে পারে না। যেরূপ ভাবে চলিতেছে, সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিলেও কিছুই হইবে না। প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান্ ভাব ছিল—যে ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন, সেই ভাবের আনন্দে, সেই ভাবের অমৃতে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে, সেই আনন্দই অপূর্ব্বশক্তিবলে বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সমস্ত বাধাগুলি অভাবনীয়রূপে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা যাদু করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে। সেই প্রকৃতি যখন কাজ করে, তখনি কাজ হয়—তাহার কাজের হিসাব আমরা কিছুই জানি না;—কোনও বুদ্ধিমান্ লোকে বা বিদ্বান্ লোকে এই কাজের নিয়ম বা উপায় কোনমতেই আগে হইতে বলিয়া দিতে পারে না। তর্কের দ্বারা তাহারা যেগুলিকে বাধা মনে করে, সেই বাধা গুলিও সহায়তা করে, যাহাকে ছোট বলিয়া প্রমাণ করে, সে-ও বড় হইয়া উঠে।

কোন জিনিষকে চাই বলিলেই পাওয়া যায় না—অতীতের সাহায্য এক্ষণে আমাদের দরকার হইয়াছে বলিলেই যে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যাইবে, তাহা কখনই না। সেই অতীতের ভাবে যখন আমাদের বুদ্ধি-মন-প্রাণ অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে, তখন দেখিতে পাইব, নব নব আকারে, নব নব বিকাশে আমাদের কাছে সেই পুরাতন

নবীন হইয়া, প্রফুল্ল হইয়া, ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহা শ্মশান-শয্যার নীরস ইন্ধন নহে, জীবননিকুঞ্জের ফলবান্ বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ উদ্বেলিত সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যখন আমাদের সমাজের মধ্যে ভাবের আনন্দ প্রবাহিত হইবে, তখন আমাদের দেশে এই সকল প্রাচীন নদীপথগুলিই কূলে-কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন স্বভাবতই আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যে জাগিয়া উঠিবে, সামসঙ্গীতধ্বনিতে জাগিয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে জাগিয়া উঠিবে। যে পাখীরা প্রভাতকালে তপোবনে গান গাহিত, তাহারাই গাহিয়া উঠিবে, দাঁড়ের কাকাতুয়া বা খাঁচার কেনারি-নাইটিঙ্গেল্ নহে।

আমাদের সমস্ত সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজত্বকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যহ তাহার পরিচয় পাইয়া মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। একসময় আমাদের হিন্দুত্ব গোপন করিবার, বর্জ্জন করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা হইয়াছিল—সেই আশায় আমরা অনেকদিন চাঁদনীর দোকানে ফিরিয়াছি ও চৌরঙ্গী-অঞ্চলের দেউড়িতে হাজ্রি দিয়াছি। আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, যদি আমাদের সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াই মহত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তবে ত আমাদের আনন্দের দিন। আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাতে যাঁহারা বাধা দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বসেন, তর্কের ধূলায় ইহার সুদূরব্যাপী সফলতা যাঁহারা না দেখিতে পান, বৃহৎ ভাবের মহত্বের কাছে আপনাদের ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের ব্যর্থ বাদ-বিবাদ যাঁহারা লজ্জার সহিত নিরস্ত না করেন, তাঁহারা যে সমাজের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছেন, সেই সমাজেরই শত্রু। দীর্ঘকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সমাজকে আহ্বান করিতেছে। য়ুরোপ তাহার

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বহুতর ভাগে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া বিহ্বল-বুদ্ধিতে তাহার মধ্যে সম্প্রতি ঐক্য সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে—ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ কোথায়, যিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে, অতি অনায়াসেই সেই [illegible]পুল জটিলতার মধ্যে ঐক্যের নিগূঢ় সরলপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে,—ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মণের পাদুকাঘাতলাভ হয় ত ব্যর্থ হইবে না—নিদ্রা অত্যন্ত গভীর হইলে এইরূপ নিষ্ঠুর আঘাতেই তাহা ভাঙ্গাইতে হয়। য়ুরোপের কর্ম্মিগণ কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে নানা দিকে নানা আঘাত করিতেছে,—ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত, বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী, আজ তাঁহারা ধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন—তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, উত্তেজনার অনুরোধে নহে—ধর্ম্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন্। নতুবা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শূদ্র, সমাজ প্রত্যহ ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য, যাহা অটল পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ় ছিল, তাহা দুরস্মৃত ইতিহাসের দিক্‌প্রান্তে মেঘের ন্যায়, কুহেলিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং কর্ম্মক্লান্ত একটি বৃহৎ কেরাণীসম্প্রদায় একপাটি বৃহৎ পাদুকা প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণপিপীলিকাশ্রেণীর মত মৃত্তিকাতলবর্ত্তী বিবরের অভিমুখে ধাবিত হওয়াকেই জীবনযাত্রানির্ব্বাহের একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিবে।

চীনেম্যানের চিঠি।

"জন্ চীনেম্যানের চিঠি" বলিয়া একখানি চটি বই ইংরাজিতে বাহির হইয়াছে। চিঠিগুলি ইংরাজকে সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছে। লেখক নিজের বিষয়ে বলেন—"দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করার দরুণ তোমাদের (ইংরাজদের) আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে কথা কহিবার কিছু অধিকার আমার জন্মিয়াছে; অপরপক্ষে, স্বদেশ হইতে দূরে আছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসি নাই। চীনেম্যান্ সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই চীনেম্যান্ই থাকে; এবং কোন কোন বিশেষ দিক্ হইতে বিলাতি সভ্যতাকে আমি যতই পছন্দ করি না কেন, এখনো ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখি নাই, যাহাতে পূর্ব্বদেশের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনপ্রকার ক্ষোভ হইতে পারে।"

ইংরাজিভাষায় লেখকের অসামান্য দখল দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইংরাজিশিক্ষায় ইনি পাকা হইয়াছেন—এইজন্য বিলাতসম্বন্ধে ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত অনভিজ্ঞ লোকের অত্যুক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই ছোট বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি। ইহা হইতে দেখিয়াছি, এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে; এসিয়া যে চিরকাল য়ুরোপের আদালতেই আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিচারকেই বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিবে, স্বীকার করিবে যে, আমাদের সমাজের বারো-আনা অংশকেই একেবারে ভিৎসুদ্ধ নির্ম্মূল করিয়া বিলাতি এঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান্ অনুসারে বিলাতি ইঁটকাঠ দিয়া

পড়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়—এই কথাটা ঠিক নহে,—আমাদের বিচারালয়ে য়ুরোপকে দাঁড় করাইয়া তাহারো মারাত্মক অনেকগুলি গলদ্ আলোচনা করিয়া দেখিবার আছে, এই বইখানি হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পায়। প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এসিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে, ইহাতেও আমাদের বল; দ্বিতীয়ত এসিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে, যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।

সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা জন্মিয়াছে; আমাদের স্বাধীন শক্তি—আমাদের চিরকালের শক্তি কোন্‌খানে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাই সন্ধান করিয়া সেইখানে আশ্রয় লইবার জন্য আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা জাগিয়াছে। বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ইহা কেবল আমাদের মধ্যে নহে। য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এসিয়াকেই সজাগ করিতেছে। এসিয়া আজ আপনাকে সচেতনভাবে, সুতরাং সবলভাবে উপলব্ধি করিতে বসিয়াছে। বুঝিয়াছে, 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জান—ইহাই মুক্তির উপায়। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—পরের অনুকরণেই বিনাশ।

বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতার সম্পদ্ আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। তাহার কল দ্রুত চলে, তাহার প্রাসাদ আকাশ স্পর্শ করে, তাহার কামান শতঘ্নী, তাহার বাণিজ্যজাল জগদ্ব্যাপী—ইহা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কিছু না হৌক্, বিপুলতার একটা গায়ের জোর আছে, সেই জোরকে ঠেলিয়া-উঠিয়া মনকে মোহমুক্ত করা আমাদের

মত দুর্ব্বলের পক্ষে বড় কঠিন। যদি বিপুলতাগ্রস্ত এই সভ্যতার দিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে তাহাতে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা কেবল বাড়িতেই থাকে,—এই সভ্যতাকেই একমাত্র আদর্শ বলিয়া বোধ হয়, এবং নিজের সামর্থ্যকে ও সম্পদ্‌কে একেবারে নগণ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইহাতে স্বচেষ্টা পরাস্ত হয়, আত্মগৌরব দূর হয়, ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না, এবং জড়ত্বের মধ্যে অনায়াসেই আত্মসমর্পণ করিয়া নিরাপত্তির আরামে নিদ্রার অচেতনতায় সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

বিশেষত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ধর্ম্মেকর্ম্মে বিদ্যাবুদ্ধিতে অত্যন্ত দীন। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে কেবলি নিজের সেই দীনতার সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি।

এ অবস্থায় প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্ম্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার পরে, এই শেষোক্ত সভ্যতাই আমাদের ছিল, সুতরাং শেষোক্ত সভ্যতার শক্তি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হইয়া আছে, ইহাই জানিয়া আমাদিগকে মাথা তুলিতে হইবে, আমাদিগকে আশা ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান দুর্গতির মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করিয়া রাখিলে, য়ুরোপীয় ব্যাপারের বৃহত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিকে দলন-পেষণ করিয়া তাহাকে আপনার চিরদাস করিয়া রাখিবে। সেই বুদ্ধির দাসত্ব, রুচির দাসত্ব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। প্রাচীন ভারতের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া নিজেকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে।

জড়পদার্থের অপেক্ষা মানুষ জটিল জিনিষ, জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্দ্ধর্ষতর, এবং বাহ্যসম্পদের অপেক্ষা সুখ অনেক বেশি দুর্লভ। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত

করিয়া, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে সভ্যতা সুখ দিয়াছে, সন্তোষ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে, সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ তাহা বস্তুপুঞ্জে এবং বাহুশক্তির প্রাবল্যে আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অতিমাত্র অধিকার করে না। সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের ন্যায় তাহার মধ্যে একটি নিগূঢ়তা আছে, গভীরতা আছে,—তাহা বাহির হইতে গায়ে পড়িয়া অভিভূত করিয়া দেয় না, নিজের চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—সংবাদপত্রে তাহার কোন বিজ্ঞাপন নাই।

এইজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তুর তালিকাদ্বারা স্ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারি না বলিয়া, আমরা পুষ্পক-রথকে রেলগাড়ি বলিতে চেষ্টা করি এবং ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা কুটিল করিয়া ফ্যারাডে-ডার্বিনের প্রতিভাকে আমাদের শাস্ত্রের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস পাই। এই সকল চাতুরী দ্বারাতেই বুঝা যায়, ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আমরা ঠিক বুঝিতেছি না এবং তাহা আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। ভারতবর্ষকে কৌশলে য়ুরোপ বলিয়া প্রমাণ না করিলে আমরা স্থির হইতে পারিতেছি না।

ইহার একটা কারণ, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যেমন আমরা অত্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি, প্রাচ্য সভ্যতাকে তেমন ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি না। ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব—একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিলেই তাহার সভ্যতা, তাহার স্থায়িত্বযোগ্যতা আমাদের কাছে যথার্থরূপে প্রমাণিত হয় না। একদিকে প্রত্যক্ষ য়ুরোপ, আর এক-

দিকে শাস্ত্রের কথা—পুঁথির প্রমাণ, একদিকে প্রবল শক্তি, আর একদিকে আমাদের দোদুল্যমান বিশ্বাসমাত্র—এ অবস্থায় অসহায় ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাখাই কঠিন।

এমন সময় আমাদের সেই পুরাতন সভ্যতাকে যদি চীনে ও জাপানে প্রসারিত দেখি, তবে বুঝিতে পারি, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহৎ স্থান আছে, তাহা কেবল পুঁথির বচনমাত্র নহে। যদি দেখি, চীন ও জাপান সেই সভ্যতার মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিতেছে, তবে আমাদের দীনতার অগৌরব দূর হয়, আমাদের ধনভাণ্ডার কোন্‌খানে, তাহা বুঝিতে পারি।

য়ুরোপের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, তাই আজ সভ্য এসিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত। প্রাচ্যসভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল, সেইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্ম্মে, তাহার বল সমাজে। তাহার ধর্ম্ম ও তাহার সমাজ যদি আপনাকে ঠেকাইতে না পারে, তবে সে মরিল। য়ুরোপের প্রাণ বাণিজ্যে, পলিটিক্সে—আমাদের প্রাণ অন্যত্র। সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এসিয়া উত্তরোত্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আমরা একাকী নহি; সমস্ত এসিয়ার সহিত আমাদের যোগ রহিয়াছে। চিনেম্যানের চিঠিগুলি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

লেখক তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিতেছেন:—আমাদের সভ্যতা জগতের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। অবশ্য ইহা হইতেই প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে ভাল;—তেমনি আবার ইহাও প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে মন্দ। এই প্রাচীনত্বের খাতিরে অন্তত এটুকুও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান আমাদিগকে যে একটা স্থায়িত্বের আশ্বাস দিয়াছে, য়ুরোপের কোন জাতির মধ্যে তাহা খুঁজিয়া

পাওয়া ভার। আমাদের সভ্যতা কেবল যে ধ্রুব, তাহা নহে, ইহার মধ্যে একটা ধর্ম্মনীতির শৃঙ্খলা আছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেবল একটা অর্থনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাই। তোমাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মের চেয়ে ভাল কি না, এ জায়গায় আমি সে তর্ক তুলিতে চাই না—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তোমাদের সমাজের উপর তোমাদের ধর্ম্মের কোন প্রভাব নাই। তোমরা খৃষ্টানধর্ম্ম স্বীকার কর, কিন্তু তোমাদের সভ্যতা কোনকালেই খৃষ্টান হয় নাই। অপর পক্ষে আমাদের সভ্যতা একেবারে অন্তরে অন্তরে কন্‌ফ্যুশীয়ান্। কন্‌ফ্যুশিয়ান্ বলাও যা, আর ধর্ম্মনৈতিক বলাও তা। অর্থাৎ ধর্ম্মবন্ধনগুলিকেই ইহা প্রধানভাবে গণ্য করে। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বন্ধনকেই তোমরা প্রথম স্থান দাও, তাহার পরে, যতটা পার, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মনীতি বাহির হইতে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা কর।

তোমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের তুলনা করিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে। সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের ভার লইতে পারে, তোমাদের পরিবার ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আহার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্বরূপমাত্র। যত সকাল-সকাল পার, ছেলেগুলিকে পাব্লিক্‌স্কুলে পাঠাইয়া দাও, সেখানে তাহারা যত শীঘ্র পারে, গৃহের প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্তিদান করিয়া বসে। যেমনি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অমনি তাহাদিগকে রোজগার করিতে ছাড়িয়া দাও—এবং তাহার পরে অধিকাংশস্থলেই বাপ-মার প্রতি নির্ভর যখনই ফুরাইল, বাপ-মার প্রতি কর্ত্তব্যস্বীকারও অমনি শেষ হইল। তাহার পরে ছেলেরা যেখানে খুসি যাক্, যাহা খুসি করুক্, যত খুসি পাক্ এবং যেমন খুসি ছড়াক্, তাহাতে কাহারো কথা কহিবার নাই;—পরিবারবন্ধন রক্ষা করিবে কি না করিবে, তাহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইচ্ছা। তোমাদের সমাজে এক একটি ব্যক্তি একজন এবং সেই এক-

জনেরা ছাড়াছাড়া। কেহ কাহারো সহিত বদ্ধ নহে, তেমনি কোথাও কাহারো শিকড় নাই। তোমাদের সমাজকে তোমরা গতিশীল বলিয়া থাক—সর্ব্বদাই তোমরা চলিতেছ। প্রত্যেকেই নিজের জন্ম একটা নূতন রাস্তা বাহির করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। যে অবস্থার মধ্যে জন্মিয়াছ, সেই অবস্থার মধ্যে স্থির থাকাকে তোমরা অগৌরব মনে কর। পুরুষ যদি পুরুষ হইতে চায় তবে সে সাহস করিবে, চেষ্টা করিবে, লড়াই করিবে এবং জয়ী হইবে। এই ভাব হইতেই তোমাদের সমাজে অপরিসীম উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বস্তুগত শিল্পাদির তোমরা উন্নতি করিতে পারিয়াছ। কিন্তু ইহা হইতেই তোমাদের সমাজে এত অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং এইজন্যই আমাদের মতে ইহার মধ্যে ধর্ম্মভাবের অভাব;—চীনেম্যানের চোখে এইটেই বেশি করিয়া ঠেকে। তোমাদের মধ্যে কেহই সন্তুষ্ট নও—জীবনযাত্রার আয়োজন বৃদ্ধি করিতে সকলেই এত ব্যগ্র যে, কাহারো জীবনযাত্রার অবকাশ জোটে না। মানুষের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধকেই তোমরা স্বীকার কর।

পূর্ব্বদেশীয় আমাদের কাছে ইহা বর্ব্বরসমাজের লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। জীবনযাত্রার উপকরণবৃদ্ধির মাপে আমরা সভ্যতাকে মাপি না, কিন্তু সেই জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও মূল্য দ্বারাই আমরা সভ্যতার বিচার করি। যেখানে কোন সহৃদয় ও ধ্রুব বন্ধন নাই, পুরাতনের প্রতি ভক্তি নাই, বর্ত্তমানের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নাই, কেবল ভবিষ্যৎকেই লুব্ধভাবে লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা আছে, সেখানে আমাদের মতে যথার্থ সমাজই নাই। যদি তোমাদের আচার-অনুষ্ঠানের নকল না করিলে ধনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে তোমাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া না যায়, তবে আমরা টক্কর না দেওয়াই ভাল মনে করি।

এ সকল ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি তোমাদের ঠিক উল্টা।

আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে। আমাদের মধ্যে নিয়ম এই যে, মানুষ যে সকল সম্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে, চিরজীবন তাহারই মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিবে। সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে, সেই ভাবেই জীবন শেষ করে এবং তাহার জীবননির্ব্বাহের সমস্ত তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান এই অবস্থারই অনুযায়ী। সে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাহার পিতামাতাকে ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছে এবং অল্পবয়স হইতেই পতি ও পিতার কর্ত্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। বিবাহের দ্বারা পরিবারবন্ধন ছিঁড়িয়া যায় না, স্বামী পরিবারেই থাকে এবং স্ত্রী আত্মীয়কুটুম্ববর্গের অঙ্গীভূত হয়। এইরূপ এক একটি কুটুম্বশ্রেণীই সমাজের এক একটি অংশ। ইহার ভূমিখণ্ড, ইহার দেবপীঠ ও পূজাপদ্ধতি, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদমীমাংসার বিচার-ব্যবস্থা, এ সমস্তই পরিবারের মধ্যে সরকারী। চীনদেশে নিজের দোষে ছাড়া কোন লোক একলা পড়ে না। চীনে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে তোমাদের মত ধনী হইয়া উঠা সহজ নহে, তেমনি তাহার পক্ষে অনাহারে মরাও শক্ত;—যেমন রোজগারের জন্য অত্যন্ত ঠেলাঠেলি করিবার উত্তেজনা তাহার নাই, তেমনি প্রবঞ্চনা এবং পীড়ন করিবার প্রলোভনও তাহার অল্প। অত্যাকাঙ্ক্ষার তাড়না এবং অভাবের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া জীবনযাত্রার উপকরণ উপার্জ্জনের অবিশ্রাম চেষ্টা ছাড়িয়া জীবনযাত্রার জন্যই সে অবসর লাভ করে। প্রকৃতির দানসকল উপভোগ করিতে শিষ্টতার চর্চ্চা করিতে, এবং মানুষের সঙ্গে সহৃদয় নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিতে, তাহার ভিতরের স্বভাব এবং বাহিরের সুযোগ দুইই অনুকূল। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ধর্ম্মের দিকেই বল, আর মাধুর্য্যের দিকেই বল, তোমাদের য়ুরোপের অধিকাংশ অধিবাসীর চেয়ে আমাদের লোকেরা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তোমাদের কার্য্যকরী এবং

বৈজ্ঞানিক সফলতার মহত্ব আমরা স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করিয়াও, তোমাদের যে সভ্যতা হইতে বড় বড় সহরে এমন রূঢ় আচার, এমন অবনত ধর্ম্মনীতি এবং বাহ্যশোভনতার এমন বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, সে সভ্যতাকে আমরা সমস্ত মন দিয়া প্রশংসা করা অসম্ভব দেখি। তোমরা যাহাকে উন্নতিশীল জাত বল, আমরা তাহা নই, এ কথা মানিতে রাজি আছি—কিন্তু ইহাও দেখিতেছি, উন্নতির মূল্য সর্ব্বনেশে হইতে পারে। তোমাদের আর্থিক লাভের চেয়ে আমাদের ধর্ম্মনৈতিক লাভকেই আমরা শিরোধার্য্য করি—এবং তোমাদের সেই সম্পদ্ হইতে যদি বঞ্চিত হইতে হয়, সে-ও স্বীকার, তবু আমাদের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্ম্মলাভকে সুনিশ্চিত করিয়াছে, তাহাকে আমরা শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই গেল প্রথম পত্র। দ্বিতীয় পত্রে লেখক অর্থনৈতিক-অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের যাহা দরকার তাহাই আমরা উৎপন্ন করি, আমরা যাহা উৎপন্ন করি, তাহা আমরাই খাই। অন্যজাতের উৎপন্নদ্রব্য আমরা চাহি নাই, আমাদের দরকারও হয় নাই। আমাদের মতে সমাজের স্থিতি রক্ষা করিতে হইলে, তাহার আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। বৃহৎ বিদেশী বাণিজ্য সামাজিক ভ্রষ্টতার একটা নিশ্চিত কারণ।

তোমরা যাহা খাইতে চাও, তাহা তোমরা উৎপন্ন করিতে পার না, তোমাদিগকে যাহা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা তোমরা ফুরাইতে পার না। প্রাণের দায়ে এমনতর কেনাবেচার গঞ্জ তোমাদের দরকার, যেখানে তোমাদের কারখানার মাল চালাইতে পার, এবং খাদ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য কিনিতে পার। অতএব যেমন করিয়া হোক্, চীনকে তোমাদের দরকার।

তোমরা চাও, আমরাও ব্যবসাদার হই এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক যে স্বাধীনতা আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিই; কেবল যে আমাদের সমস্ত কারকারবার উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিই, তাহা নহে, আমাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, আমাদের সাবেক রীতিনীতি, সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলি। এমত অবস্থায়, তোমাদের দশাটা কি হইয়াছে, তাহা যদি বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি, তবে আশা করি, মাপ করিবে।

যাহা দেখা যায়, সেটা ত বড় উৎসাহজনক নহে। প্রতিযোগিতা-নামক একটা দৈত্যকে তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ, এখন আর সেটাকে কিছুতেই কায়দা করিতে পারিতেছ না। তোমাদের গত একশো বৎসরের বিধি-বিধান কেবল এই আর্থিক বিশৃঙ্খলাকে সংযত করিবার জন্য অবিশ্রাম নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। তোমাদের গরিবেরা, মাতালেরা, অক্ষমেরা, তোমাদের পীড়া ও জরাগ্রস্তগণ একটা বিভীষিকার মত তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মানুষের সহিত সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধন তোমরা ছেদন করিয়া বসিয়া আছ, এখন ষ্টেট্‌ অর্থাৎ সরকারের অব্যক্তিক উদ্যমের দ্বারা তোমরা ব্যক্তির সমস্ত কাজ সারিয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ দায়িত্ব-বিহীনতা। তোমাদের কারবারের সর্ব্বত্রই তোমরা ব্যক্তির জায়গায় কোম্পানি এবং মজুরের জায়গায় কল বসাইতেছ। মুনফার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত—শ্রমজীবীর মঙ্গলের ভার কাহারই নহে, সেটা সরকারের। সরকার সেটাকে সামলাইয়া উঠিতে পারেন না। সহস্রক্রোশ দূরে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি কোথাও মাশুলের কোন পরিবর্ত্তন হয়, তবে তোমাদের লক্ষ লোকের কারবার বিশ্লিষ্ট হইবার জো হয়—যাহার উপরে তোমাদের হাত নাই, তাহার উপরে তোমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। তোমাদের মূলধন একটা সজীব পদার্থ, সেটা খোরাকের

জন্ত সর্ব্বদাই চীৎকার করিতেছে; তাহাকে আহার না জোগাইলে সে তোমাদের গলা চাপিয়া ধরে। তোমরা যে উৎপন্ন কর, সেটা ইচ্ছামত নহে, অগত্যা, এবং তোমরা যে কিনিয়া থাক, সেটা যে চাও বলিয়া, তাহা নহে, সেটা তোমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া। এই যে বাণিজ্যটাকে তোমরা মুক্ত বল, ইহার মত বদ্ধ বাণিজ্য আর নাই। কিন্তু ইহা কোন বিবেচনাসঙ্গত ইচ্ছার দ্বারা বদ্ধ নহে, ইহা আকস্মিক খেয়ালের স্তূপাকার মূঢ়তার দ্বারা বন্দীকৃত।

চীনেম্যানের চক্ষে তোমাদের দেশের ভিতরকার আর্থিক অবস্থা এইরকমই ঠেকে। পররাষ্ট্রের সহিত তোমাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ, সে-ও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়। পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে ধারণা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তখন শান্তির সত্যযুগ আসিবে। কাজে দেখা গেল, সমস্তই উল্টা। প্রাচীনকালের রাজাদের অত্যাকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মযাজকদের গোঁড়ামীর চেয়ে এই বাণিজ্যস্থান লইয়া পরস্পর টানাটানিতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা আরো বেশি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর যেখানেই একটুখানি অপরিচিত স্থান ছিল, সেইখানেই য়ুরোপের লোক একেবারে ক্ষুধিত হিংস্রজন্তুর মত হুঙ্কার দিয়া পড়িতেছে। এখন য়ুরোপের এলাকার সীমানার বাহিরে এই লুণ্ঠনব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভাগাভাগি চলিতেছে, ততক্ষণ পরস্পরের প্রতি পরস্পর কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতেছে। আজ হোক্‌ বা কাল হোক্‌, যখন আর বাঁটোয়ারা করিবার জন্ত কিছুই বাকি থাকিবে না, তখন তাহারা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়িবে। তোমাদের শস্ত্রসজ্জার এই আসল তাৎপর্য্য—হয় তোমরা অন্তকে গ্রাস করিবে, নয় অন্তে তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। যে বাণিজ্যসম্পর্ককে তোমরা শান্তির বন্ধন মনে করিয়াছিলে, তাহাই তোমাদিগকে পরস্পরের গলাকাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে

এবং তোমাদের সকলকে একটা বিরাট্ বিনাশব্যাপারের অনতিদূরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছে।

লেখক বলেন, পরিশ্রম বাঁচাইবার কল তৈরি করিতে তোমরা যে বুদ্ধি খাটাইতেছ, তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে না। তাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা যে মঙ্গলই, আমার মতে, এমন কথা মনে করিবার হেতু নাই। ধন কিরূপে ভাগ হয় এবং সেই ধনে জাতির চরিত্রের উপরে কি ফল হয়, তাহাই চিন্তার বিষয়। সেইটে যখন চিন্তা করি, তখন বিলাতি পদ্ধতি চীনে ঢুকাইবার প্রস্তাবে মন বিগড়িয়া যায়।

এই তোমরা যতদিন ধরিয়া যন্ত্রতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে লাগিয়াছ, ততদিনে, তোমাদের শ্রমজীবীদিগকে সঙ্কটে ফেলিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের কোন একটা ভাল উপায় বাহির কর নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ টাকা করা তোমাদের প্রধান লক্ষ্য, জীবনের আর সমস্ত লক্ষ্য তাহার নীচে। চীনেম্যানের কাছে এটা কিছুতেই উৎসাহজনক ঠেকে না। বিলাতি কারবারের প্রণালী যদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায়, তবে তাহার চল্লিশকোটি অধিবাসীর মধ্যে যে নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিবে—অন্তত আমি ত তাহাকে অত্যন্ত আশঙ্কার চক্ষে দেখি! তোমরা বলিবে, সে বিশৃঙ্খলা সাময়িক, আমি ত দেখিতেছি, তোমাদের দেশে তাহা চিরস্থায়ী। আচ্ছা সে কথাও যাক্, তাহাতে আমাদের লাভটা কি? আমরা ত তোমাদেরই মত হইয়া যাইব! সে সম্ভাবনা কি অবিচলিতচিত্তে কল্পনা করা যায়? তোমাদের লোকেরা না হয় অমোদের চেয়ে আরামে খায় বেশি, পান করে বেশি, নিদ্রা যায় বেশি—কিন্তু তাহারা প্রফুল্ল নয়, সন্তুষ্ট নয়, শ্রমানুরাগী নয়, তাহারা আইন মানে না। তাহাদের কর্ম্ম শরীরমনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর,—তাহারা প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া, ভূমিখণ্ডের অধিকার হইতে

বঞ্চিত হইয়া সহরে এবং কারখানার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকে।

আমাদের কবিগণ—লেখকগণ ধনের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, নানাপ্রকার উদ্যোগের মধ্যে, কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন নাই, কিন্তু মানবজীবনের অত্যন্ত সরল ও বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধগুলির সংযত, সুনির্ব্বাচিত, সুমার্জ্জিত রসাস্বাদনের পথে আমাদের মনকে তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই জিনিষটা আমাদের আছে—এটা তোমরা আমাদিগকে দিতে পার না, কিন্তু এটা তোমরা অনায়াসে অপহরণ করিতে পার। তোমাদের কলের গর্জ্জনের মধ্যে ইহার স্বর শোনা যায় না, তোমাদের কারখানার কালো ধোঁয়ার মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না,—তোমাদের বিলাতি জীবনযাত্রার ঘূর্ণা এবং ঘর্ষণের মধ্যে ইহা মরিয়া যায়। যে কেজো লোকদিগকে তোমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া থাক, যখন দেখি তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টায়, দিনের পর দিনে, বৎসরের পর বৎসরে তাহাদের জাঁতার মধ্যে আনন্দহীন অগত্যা-প্রেরিত খাটুনিতে নিযুক্ত, যখন দেখি তাহাদের দিনের উৎকণ্ঠাকে তাহারা স্বল্পাবশিষ্ট অবকাশের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে, এবং পরিশ্রমের দ্বারা ততটা নহে, যতটা শুষ্ক সঙ্কীর্ণ দুশ্চিন্তা দ্বারা আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তখন—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈশ্যবৃত্তির সরলতর পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়া আমি সন্তোষলাভ করি—এবং আমাদের যে সকল চিরব্যবহৃত পথগুলি আমাদের অভ্যস্ত চরণের কাছে এমন পরিচিত যে, তাহা দিয়া চলিবার সময়েও অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আমাদের অবকাশের অভাব ঘটে না—তোমাদের সমুদয় নূতন ও ভয়সঙ্কুল বর্ত্মের চেয়ে সেই পথগুলিকে আমি অধিক মূল্যবান্ বলিয়া গৌরব করি।

ইহার পরে লেখক রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,

গবর্মেণ্ট্ তোমাদের কাছে এতই প্রধান এবং সর্ব্বত্রই সে তোমাদের সঙ্গে এমনি লাগিয়াই আছে যে, যে জাতি গবর্মেণ্ট্‌কে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কল্পনাই করিতে পার না। অথচ আমাদেরই সেই অবস্থা। আমাদের সভ্যতার সরল এবং অকৃত্রিম ভাব, আমাদের লোকদের শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি, এবং সর্ব্বোচ্চে আমাদের সেই পরিবারতন্ত্র, যাহা পোলিটিক্যাল্, সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ, তাহারা আমাদিগকে গবর্মেণ্ট্-শাসন হইতে এতটা-দূর মুক্তিদান করিয়াছে যে, য়ুরোপের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমাদের সমাজের গোড়াকার জিনিষগুলি কোন রাজক্ষমতার স্বেচ্ছাকৃত সৃজন নহে। আমাদের জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরূপ শরীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোন গবর্মেণ্ট্ তাহাকে গড়ে নাই, কোন গবর্মেণ্ট্ তাহার বদল করিতে পারে না। এক কথায়, আইন-জিনিষটা উপর হইতে আমাদের মাথায় চাপান হয় নাই,—তাহা আমাদের জাতিগত জীবনের মূলসূত্র, এবং যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য চীনে গবর্মেণ্ট্ যথেচ্ছাচারী নহে, অত্যাবশ্যকও নয়। রাজপুরুষদের শাসন তুলিয়া লও, তবু আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় পূর্ব্বের মতই চলিয়া যাইবে। যে আইন আমরা মান্য করি, সে আমাদের স্বভাবের আইন, বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় তাহা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—বাহিরের শাসন তুলিয়া লইলেও ইহার কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। যাহাই ঘটুক্ না, আমাদের পরিবার থাকে, পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই গঠনটি থাকে, সেই শৃঙ্খলা, কর্ম্মনিষ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার ভাবটি থাকিয়া যায়। ইহারাই চীনকে তৈরি করিয়াছে।

তোমাদের পশ্চিমদেশে গবর্মেণ্ট্ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে

কোন মূলবিধান নাই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অন্তহীন আইন পড়িয়া আছে। মাটি হইতে কিছুই গজাইয়া উঠে না, উপর হইতে সমস্ত পুঁতিয়া দিতে হয়। যাহাকে একবার পোঁতা হয়, তাহাকে আবার পোঁতা দরকার হয়। গত শত বৎসরের মধ্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত সমাজকে উলটাইয়া দিয়াছ। সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্ম্ম, চরিত্র, শ্রেণীবিভাগ পদবিভাগ, অর্থাৎ মানবসম্বন্ধগুলির মধ্যে যাহা কিছু সব চেয়ে উদার ও গভীর, তাহাদিগকে একেবারে শিকড়ে ধরিয়া উপড়াইয়া কালের স্রোতে আবর্জ্জনার মত ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্যই তোমাদের গবর্মেণ্ট্‌কে এত বেশি উদ্যম প্রয়োগ করিতে হয়—কারণ, গবর্মেণ্ট্‌ নহিলে কে তোমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিবে? তোমাদের পক্ষে গবর্মেণ্ট্‌ যত একান্ত আবশুক, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব্বদেশের পক্ষে তত নয়। আমার কাছে এটা একটা অমঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়—কিন্তু দেখিতেছি, ইহা নহিলেও তোমাদের চলিবার উপায় নাই। তবু, এত বড় কাজটা যাহাকে দিয়া আদায় করিতে চাও, সেই যন্ত্রটার অসামান্য অপটুতা দেখিয়া আমি আরো আশ্চর্য্য হই। যোগ্য-লোক নির্ব্বাচনের সুনিশ্চিত উপায় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা দুরূহ, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তবু এটা বড়ই অদ্ভুত যে, যাহাদের উপরে এমন একটা মহৎ-ভার দেওয়া হয়, তাহাদের ধর্ম্মনৈতিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের কোনপ্রকার পরীক্ষার চেষ্টা হয় না।

ইলেক্‌শন্‌-ব্যাপারটার অর্থ কি? তোমরা মুখে বল, তাহার অর্থ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন—কিন্তু তোমরা মনে মনে কি নিশ্চয় জান না, তাহার অর্থ তাহা নহে? বস্তুত এক একটি দলীয় স্বার্থেরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। জমিদার, মদের কারখানার কর্ত্তা, রেল কোম্পানির অধ্যক্ষ—ইহারাই কি তোমাদিগকে শাসন করিতেছে না? আমি জানি, একদল আছে, তাহারা 'মাস্‌' অর্থাৎ জনসাধারণের

প্রচণ্ড পশুশক্তিকেও এই কর্ত্তৃপক্ষদের দলভুক্ত করিয়া সামঞ্জস্যসাধন করিতে চাহে। কিন্তু তোমাদের দেশে জনসাধারণও যে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ দল—তাহাদেরও একটা দলগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ আছে। তোমাদের এই যন্ত্রটার উদ্দেশ্য দেখিতেছি, একটা গর্ত্তের মধ্যে কতকগুলা প্রাইভেট্ স্বার্থের আত্মম্ভরী শক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া,—তাহারা শুদ্ধমাত্র পরস্পর লড়াইয়ের জোরেই সাধারণের কল্যাণে উপনীত হইবে। ধর্ম্ম এবং সদ্বিবেচনার কর্ত্তৃত্বের উপর চীনেম্যানের এমন একটা মজ্জাগত শ্রদ্ধা আছে যে, তোমাদের এই প্রণালীকে আমার ভালই বোধ হয় না। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র আমি এমন সকল লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা তোমাদের ব্যবস্থাযোগ্য সমস্ত বিষয়গুলিকে সুগভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিচার পক্ষপাতশূন্য, উৎসাহ নিস্বার্থ এবং নির্ম্মল,—কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাজ্ঞতাকে কোন কাজে লাগাইবার আশাও করিতে পারেন না—কারণ, তাঁহাদের প্রকৃতি, তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের অভ্যাস, জানপাদিক ইলেক্‌শনের উপদ্রব সহ্য করিবার পক্ষে তাঁহাদিগকে অপটু করিয়াছে। পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়াও একটা ব্যবসাবিশেষ—এবং ধর্ম্মনৈতিক ও মানসিক যে সকল গুণ সাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য আবশ্যক, এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার গুণ তাহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়!

আমি সংক্ষেপে চীনেম্যানের পত্রের প্রধান অংশগুলি উপরে বিবৃত করিলাম। এই পত্রগুলি পড়িলে প্রাচ্যসমাজের সাধারণ ভিত্তি-সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যে ঐক্য, তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, এই যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা, সন্তোষ এবং সংযমের উপরে সমস্ত সমাজকে গড়িয়া তোলা—তাহার চরম সার্থকতার কথা এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। চীনদেশ সুখী, সন্তুষ্ট, কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সার্থকতা পায় নাই। অসুখে-অসন্তোষে মানুষকে

ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু সুখে-সন্তোষে মানুষকে ক্ষুদ্র করে। চীন বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃক্‌পাত করি নাই নিজের এলাকার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ কথা যথেষ্ট নহে। এই সংকীর্ণতাটুকুর মধ্যে সরল উৎকর্ষ লাভ করাকেই চরম মনে করিলে হতাশ হইতে হয়। জলধারা যদি সমুদ্রকে চায়, তবে নিজেকে দুই তটের মধ্যে সংহত-সংযত করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে একজায়গায় আনিয়া বদ্ধ করিলে চলে না। মুক্তির জন্যই তাহাকে সংযত হইতে হয়, কিন্তু নিজেকে বন্দী করিলে তাহার চরম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—তাহা হইলে নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুদ্রের অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত-সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধচেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহ্যবিষয়ে সঙ্কীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগদান করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে, সুখশান্তিসন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল। যদি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই, জড়ত্ববশত সেই পরিণামকে উপেক্ষা করি, তবে বন্ধন কেবল বন্ধনই থাকিয়া যায়, তবে অতিক্ষুদ্র সন্তোষ-শান্তির কোন অর্থই থাকে না। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ক্ষুদ্র নহে, তাহা ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভারতের ব্রহ্মবাদিনী বলিয়াছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন

কুর্য্যাম্—যাহার দ্বারা অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব? কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা আমি অমর হইব না, তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ যদি আমাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সমাজ আমার কে? সমাজকে রাখিবার জন্য যে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না—য়ুরোপও বলে, individualকে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে, সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষও অত্যন্ত অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ। সাংসারিক পরিপূর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাকে বেষ্টিত, বদ্ধ করিত না, তাহার বিপরীতই করিত। যখন সমস্ত সঞ্চিত হইয়াছে, ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছে, যখন সেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সংসারের মধ্যে আরাম করিবার, ভোগ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সংসারপরিত্যাগের ব্যবস্থা—যতদিন খাটুনি, ততদিন তুমি আছ, যখন খাটুনি বন্ধ, তখন আরামে ফলভোগের দ্বারা জড়ত্বলাভ করিতে বসা নিষিদ্ধ। সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল—তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান—কিন্তু চাকা অত্যন্ত ঘুরিলে যেমন তাহাকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মার অত্যন্ত বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে চতুর্দ্দিকে নানারূপে অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই আমাদের সমাজের কাজ ছিল। আমাদের সমাজে প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া প্রত্যহই নিঃস্বার্থ মঙ্গলসাধনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা

ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়াই আমরা তাহা লইয়া গৌরব করি। বাসনাকে ছোট করিলে আত্মাকেই বড় করা হয়, এইজন্যই আমরা বাসনা খর্ব্ব করি—সন্তোষ অনুভব করিবার জন্য নহে। য়ুরোপ মরিতেও রাজি আছে, তবু বাসনাকে ছোট করিতে চায় না, আমরাও মরিতেও রাজি আছি, তবু আত্মাকে তাহার চরমগতি—পরমসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া ছোট করিতে চাই না। দুর্গতির দিনে ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতোধারা 'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।

সেইজন্য আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না, আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্টভাবে উদ্যত হইব, তখনই মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।

ফরাসী মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত করি।

তিনি বলেন, আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, কি এসিয়ায় কি অন্যত্র, এমন কি, প্রাচীন গ্রীস্‌রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখীভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবয়ববিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়।

যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচার-ব্যবহারে, তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলিতে, ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেই সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহারা সেই কর্ত্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

এইরূপ একভাবের কর্ত্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্নরূপ ফললাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রীস অতি আশ্চর্য্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোন জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড় আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রীক্-

সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল, তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোন নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল। তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিঁকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই একজায়গায় আসিয়া বদ্ধ হইয়া গেল।

প্রাচীন সভ্যতামাত্রেই একটা না একটা কিছুর একাধিপত্য ছিল। সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত। এই ঐক্য, এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত। এই কারণেই প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম ও চারিত্র গ্রন্থে, ইতিহাসে কাব্যে সর্ব্বত্রই একই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জ্ঞানে এবং কল্পনায়, তাহাদের জীবনযাত্রায় এবং অনুষ্ঠানে, এই একই ছাঁদ। এমন কি, গ্রীসেও জ্ঞানবুদ্ধির বিপুলব্যাপ্তিসত্ত্বেও তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আশ্চর্য্য একপ্রবণতা দেখা যায়।

য়ুরোপের আধুনিক সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া যাও, দেখিবে, তাহা কি বিচিত্র, জটিল এবং বিক্ষুব্ধ। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকলরকম মূলতত্ত্বই বিরাজমান; লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজ-পদ্ধতির সকল পর্য্যায়, সকল অবস্থাই, বিজড়িত হইয়া দৃশ্যমান; স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার সর্ব্বপ্রকার ক্রমান্বয় ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিচিত্রশক্তি স্থির নাই, ইহারা আপনা-আপনির মধ্যে কেবলি লড়িতেছে। অথচ

ইহাদের কেহই আর সকলকেই অভিভূত করিয়া সমাজকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধি-শক্তি পাশাপাশি কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতে পাই,—তাহাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

চারিত্রে, মতে এবং ভাবেও এইরূপ বৈচিত্র্য এবং বিরোধ। তাহারা অহরহ পরস্পরকে লঙ্ঘন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, সীমাবদ্ধ করিতেছে, রূপান্তরিত করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। একদিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা, অন্যদিকে একান্ত বাধ্যতা-শক্তি; মনুষ্যে মনুষ্যে আশ্চর্য্য বিশ্বাসবন্ধন, অথচ সমস্ত শৃঙ্খল মোচনপূর্ব্বক বিশ্বের আর কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া একাকী নিজের স্বেচ্ছামতে চলিবার উদ্ধত বাসনা। সমাজ যেমন বিচিত্র, মনও তেমতি বিচিত্র।

আবার সাহিত্যেও সেই বৈচিত্র্য। এই সাহিত্যে মানবমনের চেষ্টা বহুধা বিভক্ত, বিষয় বিবিধ, এবং গভীরতা দূরগামিনী। সেই জন্যই সাহিত্যের বাহ্য আকার ও আদর্শ প্রাচীনসাহিত্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, সরল ও সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের পরিস্ফুটতা, সরলতা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিসীম বহুলতায়, রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অংশে প্রত্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অসুবিধাও আছে। ইহার কোন একটা অংশকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে গেলে, হয় ত, প্রাচীনকালের তুলনায় খর্ব্ব দেখিতে পাইব—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে, ইহার ঐশ্বর্য্য আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইবে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা পঞ্চদশ-শতাব্দ-কাল টিঁকিয়া আছে এবং বরাবর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা গ্রীক্‌সভ্যতার ন্যায় তেমন দ্রুতবেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখনো ইহা সম্মুখে ধাবমান। অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব—এক আদর্শের একাধিপত্যে অধীনতাবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে কোন এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায়, এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে। ক্রমাগত বিবাদে এই সকল বিরোধি-শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূলপক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

ইহাই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।

গিজো বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের সংগ্রাম। ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন একটি নিয়ম, কোন এক প্রকারের গঠনতন্ত্র, কোন একটি সরলভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা অধিকার করিয়া, তাহাকে একটিমাত্র কঠিন ছাঁচে ফেলিয়া, সমস্ত বিরোধী প্রভাবকে দূর করিয়া, শাসন করিবার ক্ষমতা পায় নাই। বিশ্বে নানা শক্তি, নানা তত্ত্ব, নানা তন্ত্র, জড়িত হইয়া যুদ্ধ করে, পরস্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে না, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় না।

অথচ এই সকল গঠন, তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য—তাহাদের সংগ্রাম ও বেগ, একটি বিশেষ ঐক্য—একটি বিশেষ আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ইহা

সঙ্কীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। জগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্ত্তি বর্জ্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিভক্ত, বিপুল এবং বহুচেষ্টাগত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরন্তন সত্যের পথ পাইয়াছে, তাহা জগদীশ্বরের কার্য্যপ্রণালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে, ঈশ্বর যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সভ্যতার শ্রেষ্ঠতাতত্ত্ব এই সত্যের উপরেই নির্ভর করে।

গিজোর মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—তিন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য বৃহদ্‌ব্যাপার, ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব ? কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব ? অন্য সকল সভ্যতাই একদেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইন্ধন যোগাইয়াছে, ততদিন তাহা জ্বলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতাহোমানলের সমিধ্‌কাষ্ঠ যোগাইবার ভার লইয়াছে—নানা দেশ নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞ-হুতাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে ? কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্ত্তৃভাব আছে,—কোন সভ্যতাই আকারপ্রকারহীন হইতে পারে না। ইহার সমস্ত অবয়বকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা কি ? তাহার বহুবিচিত্র চেষ্টা ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায় ?

য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। জাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসের কোন্ গূঢ়নিয়মে দেশবিশেষের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে, তখন ধ্বংস অদূরবর্ত্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম্ম আছে, তেমনি জাতিধর্ম্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এক সময় আর্য্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণশূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্চতর ধর্ম্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চ্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম্ম লইয়া

পূর্ব্বের মত আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্রসম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।

ইংরাজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্বলাভের অধিকারী হইল, তখনি ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূর্চ্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই, ব্রাহ্মণধর্ম্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা নিত্যধর্ম্মকে নানাস্থানে খর্ব্ব করিয়াছিল বলিয়াই, তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্ম্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্ম্মকে প্রকাশ্য-ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।

ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, যে ধর্ম্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয়

তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জ্জনীয়, এ কথা একপ্রকার সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্ম্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেই জন্য ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, রুশ, ইহারা পরস্পরকে কপট, ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্দ্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃষ্টান্ মিসনারীদের মুখেও ‘ভাই’কথার মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

জগদ্বিখ্যাত পরিহাসরসিক মার্কট্বোয়েন গত ফেব্রুয়ারি মাসের নর্থ আমেরিকান্ রিভিয়ু পত্রে “তিমিরবাসী ব্যক্তিটির প্রতি” (To the person sitting in darkness) নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধিলক্ষণ কিছু কিছু চোখে পড়িবে। তীব্র পরিহাসের দ্বারা প্রখরশাণিত সেই প্রবন্ধটি বাঙলায় অনুবাদ করা অসম্ভব। লেখাটি সভ্যমণ্ডলীর রুচিকর হয় নাই; কিন্তু শ্রদ্ধেয় লেখক স্বার্থপর সভ্যতার বর্ব্বরতার যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং হানাহানিকাড়াকাড়ির যে চিত্র তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার বিভীষিকা তাঁহার উজ্জ্বল পরিহাসের আলোকে ভীষণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা যে য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্ম্মকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে, তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিপ্লিং এক্ষণে ইংরাজি

সাহিত্যের শীর্ষস্থানে, এবং চেম্বর্লেন ইংরাজ রাষ্ট্রব্যাপারের এক জন প্রধান কাণ্ডারী। ধূমকেতুর ছোট মুণ্ডটির পশ্চাতে তাহার ভীষণ ঝাঁটার মত পুচ্ছটি দিগন্ত ঝাঁটাইয়া আসে—তেমনি মিশনরির করধৃত খৃষ্টান্ ধর্ম্মালোকের পশ্চাতে কি দারুণ উৎপাত জগতকে সন্ত্রস্ত করে, তাহা এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়া গেছে। এ সম্বন্ধে মার্কটোয়েনের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[*]

---

[*] The following is from the "New York Tribune" of Christmas Eve. It comes from that Journal's Tokio Correspondent. It has a strange and impudent sound, but the Japanese are but partially civilized as yet. When they become wholly civilzed they will not talk so:

"The missionary question; of course, occupies a foremost place in the discussion. It is now felt as essential that the Western Powers take cognizance of the sentiment here, that religious invasions of Oriental countries by powerful Western organizations are tantamount to filibustering expeditions, and should not only be discountenanced but that stern measures should be adopted for their suppression. The feeling here is that the missionery organizations constitute a constant menace to peaceful international relations."

Shall we? That is, shall we go on conferring our Civilzation upon the peoples that sit in darkness, or shall we give those poor things a rest? Shall we bang right ahead in our old-time, loud, pious way, and commit the new century to the game; or shall we sober up and sit down and think it over first? Would it not be prudent to get our Civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of Glass Beads and Theology, and Maxim Guns and Hymn Books, and Trade-Gin and Torches of Progress and Enlightenment (patent adjustable ones, good to fire villages with, upon occasion), and balance the books, and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেই জন্য রাষ্ট্রীয়-মহত্ত্ব-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল্ মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজামহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্ত্তব্যের মধ্যে

---

whether to continue the business or sell out the property and start a new Civilization Scheme proceeds ?

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who Sits in Darkness has been a good trade and has paid well, on the whole ; and there is money in it yet, if carefully worked—but not enough, in my judgement, to make any considerable risk advisable. The people that Sit in Darkness are getting to be too scarce—too scarce and too shy. And such darkness as is now left is really of but an indifferent quality, and not dark enough for the game. The most of those People that Sit in Darkness have been furnished with more light than was good for them or profitable for us. We have been injudicious.

সমস্ত জগতের প্রতি কর্ত্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল্ কর্ত্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই, আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর্ বন্দুক্ ও দম্‌দম্ বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের দ্বারা যাহা পাইব, তাহার দ্বারা আমরা কিছুই বড় হইব না।

পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন্‌ই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

এই ন্যাশনাল্ আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি? আমরা কি পরস্পর বলাবলি করি না যে, নিজের স্বার্থের জন্য যাহা দূষণীয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য তাহা গর্হিত নহে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই কি বলে না?—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

বারোয়ারি-মঙ্গল।

আমাদের দেশের কোন বন্ধু অথবা বড়লোকের মৃত্যুর পর আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এইজন্য আমরা পরস্পরকে অনেকদিন হইতে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছি—অথচ সংশোধনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ধিক্কার যদি আন্তরিক হইত, লজ্জা যদি যথার্থ পাইতাম, তবে এতদিনে আমাদের ব্যবহারে তাহার কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত।

কিন্তু কেন আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই, অথচ লজ্জা পাই না? ইহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঘা মারিলে যদি দরজা না খোলে, তবে দেখিতে হয়, তালা বন্ধ আছে কি না।

স্বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্যব্যক্তির জন্য পাথরের মূর্ত্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এইপ্রকার মার্ব্বলপাথরের পিণ্ডদান-প্রথা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াছি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, ‘আহা, দেশের এত-বড় লোকটাও গেল’—কিন্তু কমিটির উপর স্মৃতিরক্ষার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপই কর্ত্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বৃত্তি একরকম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানাকারণে নানারকম হইয়া থাকে। ইংরাজ প্রিয়ব্যক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে চাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নামধাম-তারিখ খুদিয়া রাখিয়া দেয় এবং তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে। আমরা পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্ম করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল্প? ভালবাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ কথা কবর এবং শ্মশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও, হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ তর্ক এই যে, “থ্যাঙ্ক্‌য়ু”র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতজ্ঞ। আমাদের হৃদয় ইহার উত্তর এই বলিয়া দেয় যে, কৃতজ্ঞতা আমার যে আছে, আমিই তাহা জানি, অতএব “থ্যাঙ্ক্‌য়ু”বাক্য ব্যবহারই যে কৃতজ্ঞতার একমাত্র পরিচয়, তাহা হইতেই পারে না।

“থ্যাঙ্ক্‌য়ু”-শব্দের দ্বারা হাতে-হাতে কৃতজ্ঞতা ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা জবাবস্বরূপ বলিতে পারি। য়ুরোপ কাহারো কাছে বাধ্য থাকিতে চাহে না—সে স্বতন্ত্র। কাহারো কাছে

তাহার কোন দাবী নাই, সুতরাং যাহা পায়, তাহা সে গায়ে রাখে না। শুধিয়া তখনি নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে আতিথ্য করিবে; যে জ্ঞানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে জ্যেষ্ঠ, সে পালন করিবে; যে কনিষ্ঠ, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ, অতিথি যদি ফিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষেই শুভ। এইজন্য নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করেন। আহূতবর্গের সন্তোষে যে একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণকারীই পায়—তাহা, মঙ্গলকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনাতৃপ্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলম্বন না হইত, তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম্ম অন্য রকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড় করিয়া দেখে, পরের জন্য কাজ করিতে তাহার সর্ব্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে যাহা দেয়, অন্তত তাহার একটা রসিদ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা অন্যের উপরে সে যদি প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিতে পারে। এইজন্য স্বাতন্ত্র্যপ্রধান সমাজকে ক্ষমতাশালী লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য সর্ব্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে, তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে, তাহারও তেমনি অনেক আয়োজনের দরকার হয়।

প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্তু স্বার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রে বলে, ডিমাণ্ড্ অনুসারে সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে যোগান্ হইয়া থাকে। খরিদ্‌দারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি, সেই সমাজেই ক্ষমতাশালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের সৃষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই খাটে, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট্‌পালট্ হইয়া যায়। ছোট বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমানসম্ভোগ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর কিছু না পার ত অন্তত তিথিনক্ষত্রের দোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলাকে পদে-পদে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে সে অনেক সময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। ইহা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন্ দিকে, তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। এইজন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্গতির লোভ দ্বারা মঙ্গলকাজ করাইবার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য্য থাকে না। তখন ফললাভের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায়সম্বন্ধে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্রহিতৈষা যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে, ততই সত্যমিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্রমহিমাকে বড় করিবার চেষ্টা হয়,—অন্ধ অহঙ্কারকে প্রতিদিন অভ্রভেদী করিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে—অবশেষে, ধর্ম্ম, যিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিজের আশ্রয়শাখাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হন, বলের দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকে

কলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি, য়ুরোপ স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিতে গিয়া প্রত্যহই বিনাশ করিতেছে।

অতএব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক্ হইতে মঙ্গলজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ সভ্য জগতের সমুদয় আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের সহায় হইবেন।

কিন্তু কল-জিনিষটাকে একেবারে বর্‌খাস্ত করা যায় না। এক এক দেবতার এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অন্ধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিতে হয়। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টানজাতির মধ্যে আন্তরিক খ্রীষ্টান কত অল্প, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানিতে পাইয়াছি। এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্ধসংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কত বিরল, তাহা আমরা চিরাভ্যাসের জড়তাবশত ভাল করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি যখন

এক হয় না, তখন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেক বাজে মাল্‌মস্‌লা আসিয়া পড়ে। যে সকল বাছা-বাছা লোক এই আদর্শের অনুসারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা ঢাকিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার সুবিধা না দেয়, তবেই বিপদ্‌। সকল দেশেই মাঝেমাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অন্ধ গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অল্পদিন হইল, ইংরাজসমাজে কার্লাইল এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব বাহনটিই যখন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, যন্ত্র যখন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্বরূপ করিবার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝেমাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়। মানুষ যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় ত ভাল, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাখে, তবেই সর্ব্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধমরা করিয়া পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায়-কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে—ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের অযত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেকসময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব্ব করি—কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জ্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার

অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্ব্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন কি ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়া মঙ্গলকেই যে ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্যদেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জ্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্ব্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা—এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জর্ম্মণি-রাশিয়া-আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বলবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে? তাহার আদর্শ এখন কোথায়? এখনকার কোন্ বণিকের আপিসে, কোন্ রণক্ষেত্রে? কোন্ কালো কোর্ত্তায়, লাল কোর্ত্তায় বা খাকি কোর্ত্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর স্তিমিত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্য গৃহস্থের কর্ম্মমুখরিত যজ্ঞশালায়। দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ কথা

আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমাদের নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত নহি। সংসারের সর্ব্বত্রই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ-দিকে কম্‌তি থাকিলেও ডান-দিকে বাড়্‌তি থাকিতে পারে। যে ওড়ে, তাহার ডানা বড়, কিন্তু পা ছোট; যে দৌড়ায়, তাহার পা বড়, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহার মঙ্গল হয়,—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভাল হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু তবে ত একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জ্জীব না হয়, তবে সে জীবনের ধর্ম্ম-অনুসারে গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে থাকে কেবলি সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শতবৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

তেমনি আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদের প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে, তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতটুকু সময় লয়! প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব

করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কি লাভ ?

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে, এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতি লাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক, সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোন বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। “গোলে হরিবোল” ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেকসময় তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক্ না কেন, ঝড়-জিনিষটা কখনই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের বিসর্জ্জন হইয়া গেছে। পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও

মনে রাখা যায় ? ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে। এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহের চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই ? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে ? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড় করে না, তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না ? তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে ? শুনিয়াছি লর্ড্‌ পামার্‌ষ্টনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট্‌ সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে একথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয় ? পামার্‌ষ্টনের নামই কি ইংলণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে—সর্ব্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল ? দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না—যদি না হইয়া থাকে, তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমনি কি কারণ আছে ?

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোন দরকার

নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মত, ছোট-বড়-মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই শাদা পাথর দিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার, তাহা ভস্ম হইয়া যাক্! মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত, তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোট এবং বড়, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়ত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী, তাহাই থাক্; যাহা মৃতদেহ, আজবাদে-কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি, এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভাল। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে, বাছাই-করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড় দুর্জ্জয় নেশা—একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে—নিরানব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ একবার বড়লোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরানব্বইয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়—

কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার ঝোঁক যতই চড়িতে থাকে, ততই এই সকল জিনিষের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেমনি য়ুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা প্রচণ্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎপরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণিসম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চ্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে, সে-ও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোন ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্ম্মে প্রাণবিসর্জ্জনপর

বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ-করাকে সেই স্মৃতিপালন কহে না, ইহা প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই-রকম—এমন কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরমসাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন, তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট্‌-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিতনামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনমতে একটা যে-কোন-প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত অবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবনচরিত। কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক—যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কি প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যত বড় করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার

জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র!

কৃত্রিম আদর্শে মনুষ্যকে এইরূপ নির্ব্বিবেক করিয়া তোলে। মেকী এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপ পুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কি হইয়াছে? ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য্য ও সত্যপরায়ণতা ও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোন জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে, আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেমনি মাহাত্ম্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট্‌খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে দানে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেট্‌ম্যান্। একই-জাতীয় সম্মানস্বর্গে সকলেরই সদ্গতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্ঘ্য মাহাত্ম্যের অপেক্ষা বেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে, এইরূপ ঘটাই অনিবার্য্য। যে আচারপরায়ণ, সে ধর্ম্মপরায়ণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাশালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। আমাদের সমাজে দলের লোকে যেমন আচারকে পূজ্য করিয়া ধর্ম্মকে খর্ব্ব করে, তেমনি য়ুরোপের সমাজে দলের লোকে ক্ষমতাকে পূজ্য করিয়া মাহাত্ম্যকে ছোট করিয়া ফেলে।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার

ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চ্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে-পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয়, বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মাল্‌মস্‌লা কিছু কম হয়, তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত, তিনি মহতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্ত্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই, এ কথা কোনমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন মহত্ত্বদ্বারা দেশের হৃদয়ে অমরস্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন—স্মরণসভার যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্মরণসভার নাই, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলভাব স্বভাবতই আমাদের কাছে কত পূজ্য, বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতায় তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম অশ্রান্ত লোকহিতৈষাই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন ফ্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য। আমাদের ভক্তি শক্তির অভ্রভেদী সিংহদ্বারে নহে, পুণ্যের স্নিগ্ধ-নিভৃত দেবমন্দিরেই মস্তক নত করে।

আমরা বলি—কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাস্যকর হয়। বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্ত্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব—অন্যত্র তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোন প্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন “গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে”, তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে হইতে পারে?

য়ুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে, তাহার উপযোগিতা নাই, এ কথা বলা মূঢ়তা। যে সকল কাজ বলসাধ্য,—বহুলোকের আলোচনার দ্বারা সাধ্য, সে সকল কাজে দল না বাঁধিলে চলে না। দল বাঁধিয়া য়ুরোপ যুদ্ধে, বিগ্রহে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রব্যাপারে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক-বাঁধা, য়ুরোপের পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ। সেইজন্য য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে, ব্যক্তিগত দয়াকে প্রশ্রয় দেয় না; দল বাঁধিয়া পূজা করিতে যায়, ব্যক্তিগত পূজাহ্নিকে মন দেয় না; দল বাঁধিয়া ত্যাগ স্বীকার করে, ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে য়ুরোপ একপ্রকার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যপ্রকার মহত্ত্ব খোয়াইয়াছে। একাকী কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। য়ুরোপে ধর্ম্মপালন করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্ম্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়গণই সদনুষ্ঠানে রত—সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে তৎপর। কৃত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে, তাহার অভাবে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু দলের বাহিরে, নামিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্য সভা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এইজন্য সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সাত্ত্বিক ভাব বিরাজমান—এখানে ছোট-বড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চায় রত, কারণ গৃহই তাহাদের মঙ্গলচর্চ্চার স্থান। এই যে আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিস্তৃত এবং

জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলতর করিতে পারি; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—য়ুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না—দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে পারি না। যেখানে দল-বাঁধা অত্যাবশ্যক, সেখানে যদি দল বাঁধিতে পারি ত ভাল, যেখানে অনাবশ্যক, এমন কি, অসঙ্গত, সেখানেও দল বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া শেষকালে দলের উগ্র নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে নিজের ব্যক্তিগতকৃত্য, তাহা প্রাত্যহিক, তাহা চিরন্তন; তাহার পরে দলীয় কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য ক্ষণকালীন—তাহা অনেকটা-পরিমাণে যন্ত্রমাত্র, তাহাতে নিজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চ্চা হয় না। তাহা ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল বাঁধিয়া উঠিতেছে—কিছুই নিভৃত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেকে না। শুভকর্ম্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিস্মৃত নহে, এখন তাহা সর্ব্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে সকল ভাল কাজ ধ্বনিত হইয়া উঠে না, আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিত্যক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগজীর্ণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঙ্কদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রহাটের মধ্যে। ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে এবং লোকহিতৈষিতা

এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়া না খাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্কুল হয় না, রোগী ঔষধ পায় না, দেশের জলকষ্ট দূর হয় না। এখন ধ্বনি এবং ধন্যবাদ এবং করতালির নেশা যখন ক্রমে চড়িয়া উঠিয়াছে, তখন সেই প্রলোভনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ঠিক যেন বাছুরটাকে কশাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।

অতএব আমরা যে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না। সকালে হয় ত শীতের আভাস, বিকালে হয় ত বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। দিশি হাল্কা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, বিলাতি মোটা কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল দিশি ও বিলাতি কোন নিয়মই পূরাপুরি খাটে না। যখন বিলাতি-প্রথায় কাজ করিতে যাই, দেশি সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জায় ধিক্কারে অস্থির হইয়া উঠি—দেশিভাবে যখন কাজ ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভাসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুকু অঙ্কপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দীনদুঃখী, সকলের জন্যই ছিল। এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র, সে নিজের ছোট ভাইকে স্কুলে পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে,

বিধবা পিসী-মাসীকে সসন্তান পালন করিতেছে। ইহাই দিশিমতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতিমতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কি করিয়া ? ইংরাজ নিজের বয়স্ক ছেলেকে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার কাছে চাঁদার দাবী করা অসঙ্গত নহে। নিজের ভোগেরই জন্য যাহার তহবিল, তাহাকে বাহ্য উপায়ে স্বার্থত্যাগ করাইলে ভালই হয়। আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে ? ইহার উপরে বারোমাসে তেরোশত নূতন-নূতন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতী সভ্যতার উত্তেজনাসত্ত্বেও গৃহীর পক্ষে বিনয় রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এত-বড় অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম, টাকা আসিতেছে না কেন, এত-বড় ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন, এত-বড় কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে কেন ? বিলাত হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হুহু করিয়া মুষলধারে টাকা বর্ষিত হইয়া যাইত,—কবে আমরা বিলাতের মত হইব ?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহুদূরে। বিলাতী মতের লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকলদিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি। এখন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে-সকল কাজের চেষ্টা করে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই পাইত না, সুতরাং অতিরিক্ত কোন কাজ না করিতে পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। যে সকল ধনীর ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত্তকাজের জন্য তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাবপূরণ করিবার জন্য

ব্যয়সাধ্য মঙ্গলকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত—তাহাদের নামোচ্চারণও অশুভকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরই বিলাতী ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত-রবাহূত-অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্য্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য—ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এতকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই ব্যক্ত হইয়াছে—সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদিগকে চাঁদা চাহিতে হয় নাই। ধনীরাই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষকালে অন্ন, জলাভাবকালে জল দান করিয়াছে,—তাহারাই দেশের শিক্ষাবিধান, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসবরক্ষা ও গুণীর উৎসাহসাধন করিয়াছে। হিতানুষ্ঠানে আজ যদি আমরা পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সামান্য ফল পাইয়া অথবা নিষ্ফল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি? বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের দ্বারবান্‌গণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে দেয় না—ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীন স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্ত্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে-পালঙ্কে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে-জুড়িতে

আমাদের ধনীদিগকে আর বদান্যতার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্যতা বিলাতী জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা, ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্তহস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্ত্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা কয়জনে বহন করিতে পারে?

কিন্তু আমাদের পরাধীন দরিদ্র দেশ কি বিলাতের সঙ্গে বরাবর এমনি করিয়া টক্কর দিয়া চলিবে? পরের দুঃসাধ্য আদর্শে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিবার কঠিন চেষ্টায় কি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে? নিজেদের চিরকালের সহজপথে অবতীর্ণ হইয়া কি নিজেকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবে না?

বিজ্ঞসম্প্রদায় বলেন, যাহা ঘটিতেছে তাহা অনিবার্য্য, এখন এই নূতন আদর্শেই নিজেকে গড়িতে হইবে। এখন প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইবে, শক্তির প্রতি শক্তি-অস্ত্র হানিতে হইবে।

এ কথা কোনমতেই মানিতে পারি না। আমাদের ভারতবর্ষের যে মঙ্গল-আদর্শ ছিল, তাহা মৃত আদর্শ নহে, তাহা সকল সভ্যতার পক্ষেই চিরন্তন আদর্শ এবং আমাদের অন্তরে-বাহিরে কোথাও ভগ্ন, কোথাও সম্পূর্ণ আকারে তাহা বিরাজ করিতেছে। সেই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপের স্বার্থ-প্রধান, শক্তিপ্রধান, স্বাতন্ত্র্যপ্রধান আদর্শের সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিতেছে। সে যদি না থাকিত, তবে আমরা অনেক পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গি হইয়া যাইতাম। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সেই ভীষ্ম-পিতামহতুল্য প্রাচীন সেনাপতির পরাজয়ে এখনো আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে, ততক্ষণ আমাদের আশা আছে। মানবপ্রকৃতিতে স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যই যে মঙ্গলের অপেক্ষা বৃহত্তর সত্য এবং

ধ্রুবতর আশ্রয়স্থল, এ নাস্তিকতাকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। আত্মত্যাগ যদি স্বার্থের উপর জয়ী না হইত, তবে আমরা চিরদিন বর্ব্বর থাকিয়া যাইতাম। এখনও বহুলপরিমাণে বর্ব্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপে বরণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির এমন ভীরুতা যেন না ঘটে! য়ুরোপ আজকাল সত্যযুগকে উদ্ধতভাবে পরিহাস করিতেছে বলিয়া আমরা যেন সত্যযুগের আশা কোনকালে পরিত্যাগ না করি! আমরা যে পথে চলিয়াছি, সে পথের পাথেয় আমাদের নাই—অপমানিত হইয়া আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে। দরখাস্ত করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড় হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোন দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই—এবং ভোগ-বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে বাণিজ্যজীবিদেশের সহিত কোন ভূমিজীবিদেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই। যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য, সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ। আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, একদিন ফিরিতেই হইবে—তখন কি লজ্জার সহিত নতশিরে ফিরিব? ভারতবর্ষের পর্ণকুটিরের মধ্যে তখন কি কেবল দারিদ্র্য ও অবনতি দেখিব? ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্য ঐশ্বর্য্যবলে দরিদ্রকে শিব, শিবকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা কি আধুনিক ভারতসন্তানের চাক্‌চিক্য-অন্ধ চক্ষে একেবারেই পড়িবে না? কখনই না। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের নূতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্ম্যকে আমাদের চক্ষে নূতন করিয়া—সজীব করিয়া দেখাইবে, আমাদের ক্ষণিক বিচ্ছেদের পরেই চিরন্তন আত্মীয়তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত সমস্ত হৃদয় দিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিব। চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে

তাহার সন্তানদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে; গৃহে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে, বাহিরে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।

অত্যুক্তি।

পৃথিবীর পূর্ব্বকোণের লোকেরা, অর্থাৎ আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে এ লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাঁহারা সাত-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালর জন্য উপদেশ দিতে আসেন, তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ, তাঁহারা যে কেবল কথা বলিতে জানেন তাহা নহে—কি করিয়া কথা শোনাইতে হয়, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের কানের উপর তাঁহাদের দখল সম্পূর্ণ।

আচারে-উক্তিতে আতিশয্য ভাল নহে, বাক্যে-ব্যবহারে সংযম আবশ্যক, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে ফলে নাই, তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের দেশশাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরুর উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে, এতদিনের শাসনের পরেও, যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে, তবে ইহা নিশ্চয়, সেই অত্যুক্তি অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ

---

* দিল্লিদরবারের উদ্যোগকালে লিখিত।

হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া চলে, সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ—যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে, সে প্রসঙ্গে আমাদের মুখে কথা বহির হয় না। আমরা মনে করি—ইংরেজ বড় বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে—প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে—"সমস্ত আপনারি—আপনারি ঘর, আপনারি বাড়ী।" ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে—"ঘরে ঢুকিতে পারি কি?" এ একরকমের অত্যুক্তি।

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে—"আমার ধন্যবাদ জানিবে!" ইহা অত্যুক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ব্ব্যচোষ্য খাইয়া এবং বাঁধিয়া এদেশীয় নিমন্ত্রিত বলে—"বড় পরিতোষ লাভ করিলাম"—অর্থাৎ আমার পরিতোষেই তোমার পারিতোষিক। নিমন্ত্রণকারী বলে—"আমি কৃতার্থ হইলাম"—ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পার।

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে প্রিয়সম্বোধন করে—অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চয়ই আরো এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি—ইহারা পৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি—ইহাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভর্ৎসনার কারণ।

তালি একহাতে বাজে না। তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়—শ্রোতা ও বক্তা যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝে, সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন Yours truly—সত্যই তোমারি, তখন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাঠটুকুকে তর্জ্জমা করিয়া

আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারি নহেন। বিশেষত বড়সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন অনায়াসে সে কথাটার ষোল-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো ষোল-আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাঁধাদস্তুরের অত্যুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্রয়োগের অত্যুক্তি ইংরেজীতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। Immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absolutely, ever so much for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্ব্বত্র যথার্থভাবে লওয়া যায়, তবে প্রাচ্য অত্যুক্তিগুলি ইহজন্মে আর মাথা তুলিতে পারে না।

বাহ্যবিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিষকে আমরা ঠিক্‌ঠাক্‌মত দেখি না, ঠিক্‌ঠাক্‌মত গ্রহণ করি না। যখন-তখন বাহিরের নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এস্থলে অজ্ঞানকৃত পাপের ডবল্‌ দোষ—একে পাপ, তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে, পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা হয়। বৃত্তান্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে যাহারা কল্পনার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাঁকি আছে, সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কাণা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল, সেই দিক্‌ হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কাণা চোখটা ছিল, ইহলোকের দিকে—সেই তরফ হইতে আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম! কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে!

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে, অন্যে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোন উপকার হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেখান হইতে যতটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্তি অলসবুদ্ধির বাহ্যবিকাশ। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে অসময়ে, উপলক্ষ্য থাক্ বা না থাক্, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে, তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না, কমিশনর সাহেবের চাপরাশকে, না, পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেণ্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিস্‌কে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষ্যে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয়, তখন, ভীতচিত্তে, শুষ্কভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অত্যুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে, তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চীৎকার করিতে থাকে—এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুরা ধরা পড়ে না, চীৎকারে তাহা চারগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ দেয় না।

জলাশয়ের জল সমতল নহে, এ কথা যখন কেহ অম্লানমুখে বলে, তখন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার সাম্রাজ্যমদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত,—আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত-বড় দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি! মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই;—মুসলমান সম্রাট্ যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন, তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে-বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চারগুণ। হতভাগ্য রাজাগুলির এইটুকুমাত্র কাজ। যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন, তখন কলনিগুলির সামান্য শাসনকর্ত্তারা মাথার মুকুটে ঝল্‌মল্ করেন; আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণনূপুরে কিঙ্কিণীর মত আবদ্ধ হইয়া কেবল ঝঙ্কার দিবার কাজ করেন—এবারকার বিলাতী দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে! হায় জয়পুর যোধপুর-কোলাপুর, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান, তাহা কি এমন করিয়া দেশে-বিদেশে ঘোষণা করিয়া আসিবার জন্যই এত লক্ষ-লক্ষ টাকা

বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলে? ইংরেজের সাম্রাজ্য-জগন্নাথজীর মন্দিরে, যেখানে কানাডা, নিয়ুজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁক্‌ডাক্ সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে কৃশজীর্ণতনু ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যে দিন বিশ্বজগতের রাজপথে তাহার অভ্রভেদী রথ বাহির হয়, সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌহার্দ্দ্য—সেদিন কার্জ্জনের নিষেধশৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষীয় রাজাদের মণিমাণিক্য লণ্ডনের রাজপথে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে এবং লণ্ডনের হাঁসপতালগুলির 'পরে রাজভক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতাবৃষ্টির বার্ত্তা ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে! এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি—খাঁটি নহে!

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়েই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিষ, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল্‌দরাজ মোগলসম্রাট্‌দের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল্ নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল্ এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত;—সাম্রাজ্যচালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজসম্রাটের নায়েব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলুণ্ঠিত পোষাকের প্রান্ত শিখ্ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন,—আকস্মিক উপদ্রবের মত একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছাস উদ্গীরিত হইয়া উঠিল,—তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।

এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে—তাহার রংচং নাই, গীতবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধুলা, নাচগান, আমোদপ্রমোদ, সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ—সে আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র, শিল্পশোভা, আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারিদিকে প্রজাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবৎ বসিত, তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ পরস্পরের আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে-সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই সকল বিনোদন-ব্যাপারে অপটু, তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে, সেখানে আমোদ-আহ্লাদের অভাব নাই—কিন্তু সে আমোদে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে পাই—কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস্ ডগ্‌কার্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি তাড়াইতেছে, মৃগয়ার সময় বাজে লোকেরা জঙ্গলের শিকার তাড়া করিতেছে এবং বন্দুকের দুটোএকটা গুলি পশুলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের মর্ম্মভেদ করিতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য্য একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্য্যহীন—তাহার সমস্ত পথই আপিস্-আদালতের দিকে—জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপ্‌ছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন্‌খানে যোগ?

গাছেলতায় ফুল ধরে, আপিসের কড়ি-বরগায় ত মাধবী-মঞ্জরী ফোটে না! এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মত; এ ছায়া তাপনিবারণের জন্য নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না।

পূর্ব্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না,—তাহা স্বাভাবিক;—সে সকল উৎসব বাদশাহ-নবাবদের ঔদার্য্যের উদ্বেলিত-প্রবাহস্বরূপ ছিল;—সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষ্যে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্রাট্প্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিশের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে, তাহার অর্দ্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না, যেদিন খরচপত্র সাম্লাইয়া চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব অল্প খরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাদিগকে খরচ করাইবেন। প্রত্যেক রাজাকে অন্তত ক'টা হাতা, ক'টা

ঘোড়া, ক'জন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোকলস্করে যথাসম্ভব অল্প খরচে চতুর সম্রাট্প্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বদান্যতা ও ঔদার্য্য—প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয় তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। একচক্ষু টাকার থলিটির দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদ্শাহের অনুকরণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এ সকল কাজ চলে না। এ সব কাজ যে স্বভাবত পারে, সে-ই পারে এবং তাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্ররাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহুসহস্র টাকা খাজ্না মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষে রাজকীয় উৎসব কি ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্তবালুকা সূর্য্যের মত তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্তবালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লিদরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভ-প্রকাশ সম্রাট্কেও শোভা পায় না—ঔদার্য্যের দ্বারা—দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্ত্তমান বাদ্শাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে, কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কি সম্মান, কি সম্পদ্, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিস্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক

দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্যজাতির নিকট খর্ব্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে সকল কাজ ইংরেজী দস্তুরমতে সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্ম্মাদিতে যে সকল উৎসব আমোদ হইত, তাহার ব্যয় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষ্যে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে-চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার খাতা বাহির হয়, রাজা-রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর-শাজাহান্ প্রভৃতি বাদ্‌শারা নিজেদের কীর্ত্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন,—এখনকার দিনে রাজকর্ম্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড় বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চ্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালে বাদশারা, নবাবরা, রাজকর্ম্মচারিগণও এই সকল মঙ্গলকার্য্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এখন রাজকর্ম্মচারীর অভাব নাই—তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু দানে ও সৎকর্ম্মে এদেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতী দোকান হইতে তাঁহারা জিনিষপত্র কেনেন, বিলাতী সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন, এবং বিলাতের কোণে বসিয়া অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁদের পেন্সন্ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে লেডি ডফারিণের নামে যে সকল হাঁসপাতাল খোলা হইল, তাহার টাকা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই জোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে—সুতরাং এই প্রকারের পূর্ত্তকার্য্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। না করুক্, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু নাই। কিন্তু কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানান্‌সই হয় না। বিশেষত আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপত্রের বেলায় বিলিতি দস্তুর হইলে আমাদের কাছে ভারি অসঙ্গত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, যে প্রাচ্যহৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্যই ত্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কশাকশি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিতেছেন—জানেন না যে, প্রাচ্যহৃদয় দানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই ভোলে। আমাদের যে উৎসব-সমারোহ, তাহা আহূত-অনাহূত-রবাহূতের আনন্দ-সমাগম; তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি পীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক;—আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙ্গীনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে দরবার—যাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্ত—তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়—আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যুক্তি কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরে মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি

সাহেবী ছাড়িয়া নবাবী ধরে, তবে তাহাতে যে আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। ঠিক খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সাম্‌নে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়িভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্য্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখ না আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি—ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা, হয় প্রচুররূপে নগ্ন, নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্ত্তাও সেই ধরণের,—হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য নাই,—তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্ব্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটিচাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মত সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির অতিটুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলঙ্কার, সুতরাং তাহা অসঙ্কোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির অতিটুকুই গভীর ভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে একঠেলায় অত্যুক্তির মাঝ-দরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হল্‌ওয়েল্ সাহেব একেবারে জনসংখ্যা

সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন! যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোন ছিদ্র নাই। ওদিকে যে গণিত শাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা খেয়াল করেন নাই। হল্‌ওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জ্জন্ সাহেবের নিকট স্পর্দ্ধা পাইয়া হল্‌ওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের "কিম্" এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র—তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোন সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপ্লিং তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ্-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে, তেমনি কিপ্লিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশপাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের প্রিয়। শিক্ষালাভ করিবার বেলাও তাহার বাস্তব চাই। খেলেনাকেও বাস্তব করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার খেলার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোষ রাঁধিয়া জন্তুটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য ইহাই

যথেষ্ট আমোদের নহে, কিন্তু সেটা যে একটা বাস্তবজন্তু ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। ব্রিটিশ খানা যে কেবল খানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তের গ্রন্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোন ব্যঞ্জনে পাখীগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক। কল্পনার নিজ্ এলাকার মধ্যেও বৃটিশ পাঠক বাস্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভাণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভাণ করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্য হইতে বাহির হইল। কিপ্লিং নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে, এসিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে নিজে ভুলাইতে পারি—লেখককে কোনরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছদ্মগোঁপদাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা বাস্তব সত্যে কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের দুঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই—আর য়ুরোপ কল্পনাকেও বাস্তব সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোক্-

সান্ করে নাই? গোপন-মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর-বানানো চলে, তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনা-বেচার বাজারে যে কিরূপ সর্ব্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে, তাহা কাহারো অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশ-বিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে, তাহা আমরা জানি—এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি! বিলাতে পলিটিক্সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় তবে শঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেণ্টে পার্লামেণ্ট-সঙ্গত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বড় বড় লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা হইয়া থাকে; হয়, এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয়, ইংলণ্ডের পলিটিক্স্ মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, এ সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে সুস্পষ্ট অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভাল, কিন্তু অত্যুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া তাহাকে বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভাল নহে—তাহাতে বিপদ্ অনেক বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে দুই পক্ষে উভয়ের ভাষা বোঝে, সেখানে পরস্পরের যোগে অত্যুক্তি আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতি অত্যুক্তি বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। এইজন্য তাহা অক্ষরে-অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া, আমরা নিজের অবস্থাকে হাস্যকর ও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের

ভাল করিবার জন্যই তোমাদের দেশ শাসন করিতেছি, এখানে শাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়, সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আকবর যাহা কল্পনামাত্র করিয়াছিলেন, আমাদের সাম্রাজ্যে তাহাই সত্যে ফলিতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি ইহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দাবীর আর অন্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই সকল অত্যুক্তিকে খর্ব্ব করিয়া লইতেছে। এখন বলিতেছে—যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি, তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব। শাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে, তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া নিতান্ত স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাতি অত্যুক্তি এমনি সুনিপুণ ব্যাপারে যে, আজো আমরা দাবী ছাড়ি নাই, আজো আমরা বিশ্বাস আঁকড়িয়া বসিয়া আছি, সেই সকল অত্যুক্তিকেই আমাদের প্রধান দলিল করিয়া আমাদের জীর্ণ-চিরপ্রান্তে বহুযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে—এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ “হাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া”—এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরাণীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টাপূর্ব্বক ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্য্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়াছে—এই ত গেল বাণিজ্য এবং কৃষি।—তাহার পর বীর্য্য এবং অস্ত্র, সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে, তোমরা কেবলি চাকুরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যবসা কর না কেন? এদিকে দেশ হইতে

বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচশতকোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতির অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলি দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায় ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য্য! হায় দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এত-বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে? অথচ পরদেশশাসনসম্বন্ধে এত বড়-বড় নীতি কথার দম্ভপূর্ণ অত্যুক্তি আর কেহ কি কখনো উচ্চারণ করিয়াছে?

কিন্তু এ সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা কেন? কোন একটা জাতিকে অনাবশ্যক আক্রমণ করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসঙ্গত নহে—ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা খাইয়া ইংরেজের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। নিতান্ত গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে যে অশিষ্টতায় দীক্ষিত করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশের জিনিষ নহে।

কিন্তু অন্যের কাছ হইতে আমরা যতই আঘাত পাই না কেন, আমাদের দেশের যে চিরন্তন নম্রতা, যে ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? ইহাকেই বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি করা।

অবশ্য পরের নিকট হইতে স্বজাতি যখন অপবাদ ও অপমান সহ্য করিতে থাকে, তখন যে আমার মন অবিচলিত থাকে, এ কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদ-লাঞ্ছনার জবাব দিবার জন্যই যে আমার এই প্রবন্ধ লেখা, তাহা নহে। আমরা যেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা করি, তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাক্‌শক্তিই আমাদের একটিমাত্র শক্তি। কামানের যে গর্জ্জন তাহা ভীষণ, কারণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গোলাটা থাকে, কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রত্যুত্তর তাহা ফাঁকা। সেরূপ খেলামাত্রে আমার অভিরুচি নাই।

ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ লেখা আমাদের স্বদেশীয় পাঠকদের জন্যই। অনেকদিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম সে সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য-প্রেম-শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীতে এক এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। এক সময়ে মধ্য এসিয়ার মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল—এক সময়ে মুসলমানগণ ধুমকেতুর মত পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে, সেই কোণ হইতে জগদ্বিনাশী ঝড় উঠিবেই।

প্রাচীনকালে এই ধ্বংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক্, রোমক, পারসীকগণ অনেক রক্তসেচন করিয়াছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থবিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে নানা আকারে নানাদিক্ হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও স্বার্থকেই বলীয়ান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাস্পৃহা কোনোকালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—এবং অধিকারলঙ্ঘনের পরিণামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।

ইহা ধর্ম্মের নিয়ম, ইহা ধ্রুব। সমস্ত য়ুরোপ আজ অস্ত্রে-শস্ত্রে দন্তুর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে।

আমাদের দেশে বিলাতি সভ্যতার এমন সকল পরম ভক্ত আছেন—যাহারা ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বিকার যাহা-কিছু দেখিতেছ, এ সমস্ত কিছুই নহে—দুই দিনেই কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিন্‌টা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে ধক্‌ধক্‌ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই পূর্ব্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখী যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে; তেমনি বায়ুকোণে রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্ব্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে,—বজ্রগর্জ্জনকে সে সার্ব্বভৌমিক প্রেমের মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি বলিয়া কল্পনা করিতেছে না। য়ুরোপ ধরণীর চারিদিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে—তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যখণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না।

এই অবস্থায় আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। আমরা যদি সংবাদ পাই যে, বিলাতি সভ্যতার মূলকাণ্ড যে পলিটিক্‌স্‌—সেই পলিটিক্‌স্‌ হইতে স্বার্থপরতা, নির্দ্দয়তা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান প্রত্যহ জগৎ জুড়িয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, এবং যদি ইহা বুঝিতে পারি যে, স্বার্থকে সভ্যতার মূলশক্তি করিলে এরূপ দারুণ পরিণাম একান্তই অবশ্যম্ভাবী, তবে সে কথা সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে—পরকে অপবাদ দিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্য নহে, নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্য।

আমরা আজকাল পলিটিক্স অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটি মাত্র মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের

একটিমাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; আমরা পলিটিক্সের মিথ্যা ও দোকানদারীর মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি; আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি—তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর কর্ম্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ-গোয়ালা বাঁটে হাত না দিলে আমাদের কামধেনু আর একফোঁটা দুধ দেয় না—নিজের বাছুরকেও নহে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে! সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য যে সকল তীক্ষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে, আশা করি তাহা বিদ্বেষবুদ্ধির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেছে না, আশা করি তাহা স্বদেশের মঙ্গল-ইচ্ছা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি খাইয়া যদি জবাব দিতে উদ্যত হইয়া থাকি, সে জবাব বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে—সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান রাখিবার জন্য, আমাদের নিজের প্রতি ভগ্নপ্রবণ বিশ্বাসকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইবার মহাবিপদ্ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবার জন্য। ইংরেজ যে পথে যাইতে চায় যাক্, যত দ্রুতবেগে রথ চালাইতে চাহে চালাক্, তাহাদের চঞ্চল চাবুকটা যেন আমাদের পৃষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অন্তিমগতি লাভ না করি, এই হইলেই হইল। ভীখ্ আমরা চাহি না; উত্তরোত্তর দুর্লভতর আঙুরের গুচ্ছ অক্ষমের অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক্, আমাদের আর ভিক্ষায় কাজ নাই—এবং এ কথা বলাও বাহুল্য, কুত্তাতেও আমাদের প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষাই বল, চাকরীই বল, যাহা পরের কাছে মাগিয়া-

পাতিয়া লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় এই ভয়ে যাহাকে পাঁজরের কাছে সবলে চাপিয়া ধরিয়া বক্ষ ব্যথিত করিয়া তুলি, তাহা খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই; কারণ, মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা সে নিজেই বোঝে না; নিজের সেই অন্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। এমন জিনিষ আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না—সেই জিনিষটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সে-ও ভাল। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' আমাদের খুব বেশি ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব, নিজে যেন আহরণ করিতে পারি, খুব বেশি সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়, এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি, তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারায় পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব; এই যদি সম্ভব হয় ত হউক্, না যদি হয়, পরে চাকরী না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয় এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারো উপর কোন দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না

করি! যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোন বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে হে মহামারি, তুমি আমাদের বান্ধব, হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়!

মন্দিরের কথা।

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহুশতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্‌-রচয়িতা ঋষিছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কি কথা গাঁথিয়াছে? ভক্তি কি রহস্য প্রকাশ করিয়াছে? মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কি বাণী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জ্বলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুণ্ঠিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাবাভারে আক্রান্ত। যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের

এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্রবৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ়-নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্ব্বত্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড-খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—সুতরাং মন যে কি বুঝিল, কি শুনিল, কি পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্ব্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছা-

বাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরাজসমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে :—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট্‌ খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয় ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজিশিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান —অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে; কারণ, মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই

মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে-কর্ম্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্য-প্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোট-বড়র ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"—

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি আবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে-ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল,—ইহারই অন্তরে নিরলঙ্কার নিভৃত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই পরিবর্ত্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গমর্ত্ত্য, বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ্ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া একবৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।—অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখীর মত করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাই কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোট পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান. তাহার মধ্যে নিত্যপরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্যের যে নিশ্চিন্ত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটিই পাখী, ডানায়-ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা একবৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই—তাহা দুই পাখীকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আরো যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জ্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" স্তব্ধভাবে নিয়ত আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত হয় নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, স্তব্ধরূপে, সাক্ষিরূপে ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে,—নির্জ্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্ম্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোট-বড় সমস্ত মানবকে আপন প্রস্তরপটে এক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে আছে—তিনি কে। এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্রমানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক কালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে!

ধম্মপদং।

ধম্মপদং।—অর্থাৎ ধম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, "ধম্মপদং" তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অন্তত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন।

এস্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে এম্‌নি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া, সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন,—যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব, ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা

ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহতমূর্ত্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদংগ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেম্‌নি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধম্মপদে, কি গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক্ হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি—সেইজন্য ধম্মপদং গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেম্‌নি সকল দেশের ইতিহাস একভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য, যখন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মেলে না, তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে য়ুরোপীয়ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন্ কোনোদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা-মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম,

কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে;—তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্ব্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কি লইয়া? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই—এবং ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহ্যরূপ যে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্ত্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্ত্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

য়ুরোপীয় নেশন্‌গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।

য়ুরোপে ধর্ম্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা

সর্ব্বাঙ্গীণভাবে কাজ করিয়াছে। ধর্ম্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে।

আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্ম্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

পলিটিক্স্ এবং নেশন্ কথাটা যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম্মকথাটাও তেম্নি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্স্ এবং নেশন্ কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না, তেম্নি ধর্ম্মশব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এইজন্য ধর্ম্মকে ইংরিজি রিলিজন্‌রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসি। এইজন্য, ধর্ম্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য, এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন্ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। লাভ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়,—কল্যাণ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে, সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—যে ব্যক্তি লোভকেই মানে, তাহার পক্ষে ঐ সকল বাধার অস্তিত্ব নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব? অন্তত ভারতবর্ষ লোভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কি বুঝিয়া মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, তাহার ভালমন্দ কর্ম্ম কিছুই নাই। আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালমন্দ সকল কর্ম্মের উদ্ভব। অতএব গোড়ায় এই আত্ম-অনাত্মের সত্যসম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষের আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্নভিন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে একজায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক্ হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া দুই না থাকে, তবে ত ভালমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মের ভালমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই যে সংসার আবর্ত্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি—এক কর্ম্মের দ্বারা আর এক কর্ম্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্ম্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়।

কিন্তু তবে ত সকল কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয়, যাহাতে কর্ম্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ কর্ম্ম শুভ, কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম,—তাঁহার আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই স্বার্থকতার উপায়ও পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে ভগবানের ইচ্ছাকে অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যেই নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অদ্বৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উদ্যত; যাঁহারা কর্ম্মের অনন্তশৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী, তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান; ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক্, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যতদূর পর্য্যন্তই যাওয়া যাক্, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তত্ত্বকে কর্ম্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসঙ্গত বোধে কোনোদিন ভীরুতাবশত কথার কথা করিয়া রাখে নাই। এইজন্য একসময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্ব্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে য়ুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্ত্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন,

তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তিসহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক-কারণে গোমাংসভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধানসত্ত্বেও অন্য সকল মাংসাহারও, এমন কি, মৎস্যভোজনও ভারতবর্ষের অনেকস্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে. তাহা সুবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্ম্মকেও ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্ম্মের ভেদ সাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্ম্মই ধর্ম্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্ম্মমাত্রেরই চরমলক্ষ্য কর্ম্ম হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক্, কর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে। অদ্বৈতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর গতসংস্কার নির্ব্বাণবাসনার মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রকৃতিভেদে যেমুক্তির আদর্শই যাহাকে আকর্ষণ করুক্ না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্ম্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম্ম তেম্‌নি কর্ম্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে-পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপ কর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপে কর্ম্মসংগ্রামের অন্ত নাই—সেখানে কর্ম্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে, কৃতকার্য্য

হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। য়ুরোপের ইতিহাস কর্ম্মেরই ইতিহাস।

য়ুরোপ কর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম্মকরাসম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে। আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অন্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে, কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসন ব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য য়ুরোপীয়সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি, সেখানে কর্ম্মই বস্তুত কর্ত্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর এক বাসনাকে, এক কর্ম্ম হইতে আর এক কর্ম্মকে বহন করিয়া চলি—হাঁপ ছাড়িবার সময় পাই না—তাহার পরে সেই কর্ম্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া-দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতেই য়ুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনোদিনই শান্তিতে লইয়া যায় না,—পরিণামহীন কর্ম্মচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি—য়ুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। য়ুরোপ বলে—প্রাপ্তি নহে, সন্ধান আনন্দ। ভারত-

বর্ষ বলে—তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল, তাহাতে আনন্দ নাই বটে; কারণ, সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই। সে প্রাপ্তি আমাদিগকে অন্ত প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি এবং তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করে, আমাদিগকে কোনোমতেই মুক্তি দেয় না। যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী, সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্ম্মকে জয়ী করিব না, কর্ম্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছে—আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বুদ্ধিপূর্ব্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্ত্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য!

সংস্কৃতভাষায় ভবশব্দের ধাতুগত অর্থ হওয়া। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। য়ুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়—আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতর ভয়ঙ্কর স্বাধীনতার চেষ্টা ভাল কি মন্দ, তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন। এরূপ নিরাসক্তি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংঘাতে তাহাদের বিপদ্ ঘটিতে পারে, এমন কি, তাহাদের মারা যাইবার কথা। অপরপক্ষে বলিবার কথা এই যে, মরা বাঁচাই সার্থকতার চরমপরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্মহত্যার জো হইয়াছিল—যদিই সে মরিত, তবু

কি তাহার গৌরব কম হইত ? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল—আর একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল—তাই বলিয়া কি উদ্ধারচেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া ধিক্কার দিতে হইবে ? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্ম্মের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে ; আজ ভারতবর্ষ যদি—জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে—জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধমুক্তির আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে অন্য সকলে তাহাকে যতই ধিক্কার দিক্, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই, য়ুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত-ভবিষ্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসাই কেবল গবর্মেণ্টের দ্বারে ভিক্ষাকার্য্যের

মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদংগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না। একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্কমোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায়-কথায় মিলাইয়া করিলেই ভাল হয়—যেখানে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবে, সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে, তবে অন্যায় হয়—কারণ ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে—এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে—

> মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া—

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন:—"মনই ধর্ম্মসমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।" যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন—"ধর্ম্মসমূহ মনঃপূর্ব্বঙ্গম, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়", তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন।

"মনই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বলিলে ভাল অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্কোছি মং অবোধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি ॥

ইহার অনুবাদে আছে:—"আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।"

'এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না" বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে—বোধ হয় "যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না" বলিলে মূলের অনুগত হইত। অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না—যথা, "আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে, তাহাদের বৈর শান্ত হয়।"

এই গ্রন্থে মূলের অন্বয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অনুবাদ থাকাতে ইহা পাঠকদের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক, সম্প্রতি ত্রিবেণী কপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক ধম্মপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও এই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারের সাহায্য করিবে।

বিজয়া-সম্মিলন।

বাংলাদেশে কতকাল হইতে কত বিজয়া দশমীর পরে ঘরে ঘরে প্রীতিসম্মিলনের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে কিন্তু অদ্য এখানে এই যে মিলনসভা আহূত হইয়াছে আশা করি আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সভা চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আশা করি আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-সম্মিলন যে একটি নূতন জীবন লইয়া অপূর্ব্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল সেই জীবনধারা কোনো দুর্দ্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয়;—আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন উৎস বিধাতার সঙ্কেতমাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনোদিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম।—যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম;—বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম; এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়—সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে

পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে—সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুল ধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে পুণ্য হইয়াছে—তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়ামিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশ-প্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সঙ্গত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মত আর কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সঙ্গত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধব-সম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

যাহা আমাদের চিরপরিচিত তাহাকে আমরা যথার্থভাবে চিনিনা এমন ঘটনা আমাদের নিজের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে একান্তই জানি বলিয়া মনে করি—হঠাৎ একদিন ঈশ্বর আমাদের চোখের পর্দা সরাইয়া দেন—অমনি দেখি যে তাহাকে এতদিন বুঝি নাই—দেখি যে আজ তাহার সমস্ত তাৎপর্য্য একেবারে নূতন করিয়া উদ্দীপ্ত হইল। সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম—এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই—যাহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইবার তাহাকে আমাদের ঘরের দাওয়ার উপরে বসাইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি যে মিলন আমাদিগকে বর দান করিবে, জয় দান করিবে, অভয় দান করিবে সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গনের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্য্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে তাহা শক্তি দান করে।

বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্ত্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্ব্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায় কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—অমনি আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বহুকোটি বাঙালীর সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেইজন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালী বাঙালীর এত কাছে আসিয়া পড়িল—আমাদের সুখ দুঃখ, বিপদ্ সম্পদ্ মান অপমান যে, আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে—আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না—আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গল মুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমাদের সমাজধর্ম্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই

১৩১২ শাল,—বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবনধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।

বন্ধুগণ, এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা সত্যরূপে না লাভ করি তাহার সহিত আমরা যথার্থ ব্যবহার স্থাপন করিতে পারিনা, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্য দুঃখস্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি যতই কথা কই সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই যে বাংলা দেশ ইহার মৃত্তিকা ইহার জল ইহার বায়ু ইহার আকাশ ইহার বন ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহা আমাদের পিতাপিতামহগণকে বহুযুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্ত্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতই সর্ব্বতোভাবে ভাল বাসিতে পারি, কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দিই। আমরা যেন ভাল বাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করি তাহার জলকে নির্ম্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালবাসি তাহাকেই আমরা সকলদিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই সকলদিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি এবং সেই আমাদের সেবার সামগ্রী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইনা।

আমি যে একা আমি নহি; আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর,

তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময় চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি এই একান্ত সত্য যতদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি ততদিন কেবলি আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরাণী সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাহারা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালীর সহিত এক বলিয়া অনুভব করিয়াছে। যতদিন তাহারা নিজেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিত ততদিন তাহারা ভুল জানিত, ইহাই মায়া। এই মায়াই তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে অপমানিত করিয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও এই ভ্রমবশতই করে। সে মনে করে আমি বুঝি স্বতন্ত্র সুতরাং মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সহিত মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায় কারণ তখন আমি জানি সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই জাপানের শতসহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। আমরা যে নিজের প্রাণটাকে টাকার থলিটাকে একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া বসিয়া থাকি নিজেকে একা বলিয়া জানাই ইহার একমাত্র কারণ। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই আমি বলিয়া জানিতে পারি তবে আমার ভয়কে আমার লোভকে দেশের মধ্যে মুক্তি দান করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারি, অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তখন যে নিতান্ত ক্ষুদ্র সেও

বৃহৎ হয়, যে নিতান্ত দুর্ব্বল সেও সবল হইয়া উঠে। আজ কতকাল পরে আমরা বাংলা দেশে এই সত্যের আভাস পাইয়াছি! সেই জন্য যাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা করি নাই তাহাও লাভ করিলাম। সেইজন্য আমরা আপনাতে আপনি বিস্মিত হইয়াছি, সেইজন্য আজ আমাদের বাঙালীর চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র হইতে যাঁহারা পৃথক্ হইয়া আছেন তাঁহাদের ব্যবহার আমাদিগকে এমন কঠোর আঘাত করিতেছে, যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, দ্বিধা করিতেছেন, সকল দিক বাঁচাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের অবজ্ঞা এমন দুর্নিবার বেগে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাসে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা বিলাস উপকরণের জন্য লজ্জিত হইতেছেন, যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া জানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, যাঁহারা বিদেশী আড়ম্বরের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলয়দীপ্তি আর প্রলুব্ধ করিতেছেনা। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ আমরা সত্য বস্তুর আভাস পাইয়াছি সেই সত্যের আবির্ভাব মাত্রেই আমরা বৃহৎ হইয়াছি বলিষ্ঠ হইয়াছি।

এখন ঈশ্বরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করি এই সত্য যেন ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এই সত্যকে যেন আবার একদিন আমাদের শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলিত হইতে না দিই; অন্তকার সংঘাত-জনিত উত্তেজনা যখন একদিন শান্ত হইয়া আসিবে তখনো যেন জীবনের প্রতিদিন এই সত্যকে আমরা অপ্রমত্ত চিত্তে সকল কর্ম্মে ধারণ ও পোষণ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে-না; কোনো আইন পাশ হউক বা না হউক বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত

করুক বা না করুক্ আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদ্দাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম! আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। যে পথ কঠিন যে পথ কণ্টকসঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে তবে তোমরা ফিরিয়োনা ফিরিয়োনা, দুর্য্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়োনা। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়োনা। যখন বিধাতার ঝড় আসে বন্যা আসে তখন সংযতবেশে আসে না কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালমন্দ লাভক্ষতি দুইই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয় তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে বিজ্ঞভাবে বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত

পূর্ব্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও,—আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দে মাতরং গীতিধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা

সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান ॥